ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশকঃ—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ।



প্রিণ্টারঃ—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড,

বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১৯২৬

[মূল্য ৸৹ বারো আনা

আশা

এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ, জগৎ-কবিসভার মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ—আমাদেরই। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁর বাক্য সুন্দর, তাঁর কাব্য সুন্দর—তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁর জীবন-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাগুলিই কেবল মনে আসছে,—

"এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম,
ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥"

... ...

এই অনন্যসুন্দরের অন্তরতম প্রতিকৃতিটি আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্র চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে তাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করুক, উন্নত করুক, ধন্য করুক—এই আশা।

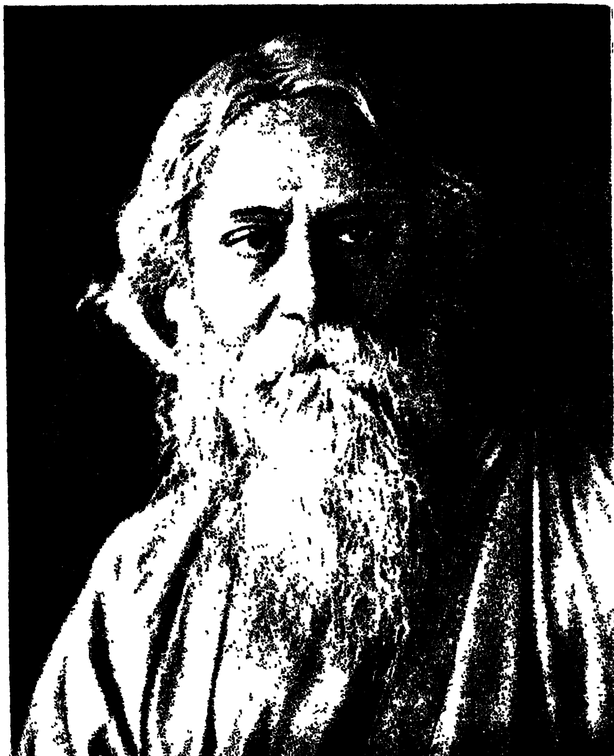
দিল্লী বেঙ্গলি ক্লব,
আশ্বিন—১৩৩৩

শ্রীযামিনীকান্ত সোম



সূচি

চিত্র-সূচি



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মুখপত্র)

ছেলেদের — — —

রবীন্দ্রনাথ

তোমরা সবাই কবিতা খুব ভালবাস নিশ্চয়। তার উপর সে কবিতা যদি তোমাদের মনের মতো হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই! তোমাদের ভেতর এমন কি কেউ আছ, যে, মেঘের উপর মেঘ জমেছে দেখে, ভাই-বোনে হাত ধরাধরি করে নাচতে-নাচতে বল না!—

"দিনের আলো নিবে এল, সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।

... ...

তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর্‌ টুপুর্‌ নদী এল বান।"

বাঁশী, ফুটবল, বন্দুক, এ সব তোমাদের কতই না প্রিয়! কিন্তু মেঘ্‌লা দিনের ঐ গানটি, এই সবের চেয়ে কি কোন অংশে কম! রবিবারের ছুটিতে তোমাদের কতই না আমোদ! কবে রবিবার আসবে এই আশায় সোমবার থেকেই তোমরা দিন গুণতে আরম্ভ কর,—

"সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়া-গাড়ি?
রবিবার সে কেন, মাগো, এমন দেরি করে?
ধীরে ধীরে পৌছয় সে সকল বারের পরে।

... ...

সোম মঙ্গল বুধের যেন মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে যেম্‌নি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি হাসিই আছে লেগে।"

... ...

তারপর, পড়া বলতে না পারার দরুণ মাষ্টার মশায়ের কাছে বকুনি খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে এসে মাকে যখন বল,—

'সাত-আট্টে সাতাশ,' আমি বলেছিলেম বলে
গুরুমশায় আমার পরে উঠ্‌ল রাগে জ্বলে।
মাগো, তুমি পাচ পয়সায় এবার রথের দিনে
সেইযে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে
খাতার নীচে ছিল ঢাকা; দেখালে এক ছেলে.
গুরুমশায় রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ফেলে।"

তোমার ছোট ভাইটি যখন পড়া করতে করতে ছুটে পালিয়ে এসে মায়ের কাছে বায়না ধরে,—

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা!
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা!
তুমি বল্‌ছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হল তাই
একদিনো কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে কর্‌তে নাই?"

আর শেষটায় তুমি নিজে যখন লেখা, পড়া, অঙ্ক-কষা—এগুলোর একটাকেও কাবু করতে না পেরে ভারী বেজার হয়ে মাকে গিয়ে বল,—

"নাই যদি হই ভালো ছেলে, কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই গুটি পোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে? আমার তাতে কিই-বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি ত সমস্ত খন ছুটি।"

আর এই সব-তাতেই সায় দিয়ে মা তোমায় কোলে তুলে নিয়ে আদর করে যখন বলেন,—

"বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্!"

তখন তোমাদের কতই না আহ্লাদ হয়! তখন তোমাদের আর কোন ভয় থাকে, না ভাবনা থাকে!

আচ্ছা, এই কবিতাগুলি তোমাদের খুবই ভাল লাগ্‌ছে নিশ্চয়। কেননা, এতে তোমাদেরই যে মনের কথা রয়েছে! তোমরা হয়তো ভাবছো, এগুলি যাঁর লেখা, তিনি তোমাদেরই একজন, হয়তো বা তিনি তোমাদের মতোই ছেলেমানুষ! এই কবিতাগুলি যাঁর, তিনি বয়সে এখন তোমাদের মতো ছেলেমানুষ

না হলেও, তিনি তোমাদের খুবই আপনার। তোমাদের কথা তিনি আরো কি বলেন শুনবে?

"খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ?
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজ!
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে!"

আর বলেন—

"খোকা বলেই ভালবাসি
ভাল বলেই নয়!"

এমন ধারা যাঁর দরদ, তিনি যে তোমাদের কত আপনার, সে কথা আর বলতে? ইনি কে, তা তোমরা এবার বুঝতে পেরেছ কি? তোমাদের ভেতর যারা বড়, এই কবিতাগুলি শুনেই তারা এঁকে চিনেছ নিশ্চয়! অনেকে হয়তো এঁকে দেখেওছ। ইনি আমাদের এই সোনার বাংলা দেশেই জন্মেছেন। নামেতেই এঁর পরিচয় —ইনি আমাদের **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

রবীন্দ্রনাথ একজন কবি। কিন্তু শুধু কবি বললে

কিছুই বলা হয় না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর শ্রেষ্ঠ ভাবুক। তিনি তাঁর গান আর কবিতার ভেতর দিয়ে এই বিশ্বজগতের মিলনের কথা এমন সুন্দর করে বলে এসেছেন, যা আর কেউ বলেন নি। ইনি যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, চীন, জাপান, আমেরিকা এই সব দেশে গেছ্‌লেন, তখন সে সব দেশের পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে ভক্তির অর্ঘ্য তিনি পেয়েছিলেন, কোন কবির জীবনে তেমন আর কখনো হয় নি। ঐ সব মহাদেশের বড় লোকেরা আর গুণী লোকেরা তাঁকে এ রকম সম্মান দেখিয়েছিলেন যে, সে রকম সম্মান সে সব দেশের সম্রাটরা পর্য্যন্ত কখনো পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে, গান আর কবিতার ভেতর দিয়ে এমন সব উঁচু ভাবের কথা বলেছেন যে, তা কেবল তোমার-আমার কথা নয়—তাকে এই সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানব-জাতির মনের কথা, প্রাণের কথা বলা যেতে পারে; আর তা এমনই এক মিলনের সুরে বাঁধা যে, তা সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতির ঝগড়া-বিবাদ, জাতিভেদ, মারামারি, কাটাকাটি মিটিয়ে দিয়ে সকল মানুষকে দেবতা করে তুলতে পারে।

তোমরা এখন থেকে তাঁর কবিতা পোড়ো, পড়ে বুঝতে চেষ্টা করো, বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে নিও ; দেখবে তা কত সুন্দর ! যতই তোমাদের জ্ঞান বাড়বে, তাঁর লেখা পড়ে ততই তোমরা মুগ্ধ হবে। দেখবে তিনি শুধু কবি নন,—তিনি তপস্বী, তিনি ত্যাগী আর সর্ব্বোপরি তিনি একজন ঋষি। রবীন্দ্রনাথের ছবিটি একবার ভাল করে দেখ দেখি। এ রকম চেহারা আর কোথাও কি দেখেছ ? ছবিটি দেখলে ঋষি বলেই কি মনে হয় না ? এই ঋষি রবীন্দ্রনাথের কথাই আজ তোমাদের শোনাব।

মনের খেলা

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়. তাঁর বাল্যজীবন বড়ই বিচিত্র। তিনি যখন ছেলেমানুষ —যখন তিনি তোমাদের মতোই শিশু, তখনই তিনি এই পৃথিবীকে এমন এক চোখে দেখতেন, যা তোমরা-আমরা সচরাচর দেখি না। এই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত জিনিষ, যেমন গাছপালা, পাখীর গান, আকাশবাতাস মেঘবৃষ্টি, ফলফুল, এমন কি রাস্তার লোকজন—যা তিনি দেখতেন, তার ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পেতেন। এই সমস্ত জিনিষ জীবন্ত হয়ে তাঁর চোখের সাম্নে ফুটে উঠতো—বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষ যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতো। কি রকম করে,—তা তাঁরই লেখা দু-একটি কবিতায় তোমাদের শোনাই—

"মেঘের মধ্যে মাগো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে!
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যেবেলা!

সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রূপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে!'



রবীন্দ্রনাথ—কৈশোরে—৮ পৃঃ

আমি বলি 'যাব কেমন করে' ?
তারা বলে 'এস মাঠের শেষে !
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে' !"

... ...

"ঐ যে রাতের তারা জানিস কি, মা, কারা ?
সারাটিখন ঘুম না জানে চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা !
আমার যেমন নেইক ডানা, আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেম্‌নি ওদের পা নেই বলে পারে না যে আস্‌তে চলে
এই পৃথিবীর পরে।

... ...

ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায় তারপরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।"

... ...

রবীন্দ্রনাথ খুব বড় ঘরের ছেলে। তাঁর বাপ-পিতামহ মস্ত ধনী। যে বংশে তিনি জন্মেছেন তা ধনে, মানে, বিদ্যায়, পদগৌরবে সব রকমেই বড়। কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় এঁদের বাড়ী।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মত বিখ্যাত বংশ শুধু কলিকাতা বা বাংলাদেশে কেন, আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এ বংশের সবাই গুণী। অনেক বিখ্যাত লোক এই বংশে জন্মেছেন। এক কথায় বলতে গেলে এই বংশটি লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিলন-স্থান।

বড় ঘরের ছেলে হলেও ছোট বেলায় রবীন্দ্রনাথকে খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতে হোত। বাবুগিরির নাম-গন্ধও তখন ছিল না। নিজেই তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—"আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মান হানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা শাদা জামার উপরে আর একটা শাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।...আমাদের চটি জুতা এক জোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম...।"

তাঁদের বাড়ীর নিয়ম-কানুনও ছিল ভারী কড়া। বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারেই বারণ। বেশীর ভাগ

সময় তাঁকে চাকরদের শাসনেই থাকতে হোত। সে বড় কড়া শাসন। তাঁদের এক ছোকরা চাকর ছিল—তার নাম শ্যাম। সে ভারী মজা করতো। সে করতো কি, রবীন্দ্রনাথকে একটি ঘরের ভেতর বসিয়ে খড়ি দিয়ে তাঁর চারদিকে গণ্ডি কেটে দিত আর খুব গম্ভীর মুখ করে বলে যেত—খবরদার, এই গণ্ডি পার হয়েছ কি বিপদে পড়েছ। রবীন্দ্রনাথ বিপদের ভয়ে গণ্ডির বাইরে যেতে সাহস করতেন না। তিনি ঘরের ভেতর চুপটি করে বসে বসে জানালার ভেতর দিয়ে বাহিরের জিনিষ তন্ময় হয়ে দেখতেন। এ সব রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা—নিজেই তিনি এ সব বলেছেন।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। পুকুর-পাড়ে একধারে ছিল প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আর এক সারি নারিকেল গাছ। তিনি জানালার খড়খড়ি খুলে সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বইয়ের মত দেখে-দেখে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতেন। কত লোক আসতো, স্নান করতে। কত রকম ভঙ্গীতে তারা ডুব পাড়তো, তা তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন। তার পর দুপুর বেলা পুকুর-ঘাট জন-শূন্য হয়ে গেলে পর, সেই প্রকাণ্ড বটগাছের তলাটা তাঁর সমস্ত

মনখানিকে দখল করে নিতো। বটগাছটার গুঁড়ির চারধারে বিস্তর ঝুরি নেমে সে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছিল। তাঁর চোখে সেই বটতলার অন্ধকার জায়গাটা তখন ভারী রহস্যময় ঠেক্‌তো। বড় হয়ে তিনি এই বটকেই উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

"নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট?

... ...

মনে কি নেই সারাটা দিন বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে অবাক্ দু-নয়নে?
তোমার তলে মধুর ছায়া তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে শালিখ পাখী দুটি।
ভাঙা ঘাটে নাইত কারা তুল্‌ত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোট ছেলে রইত চেয়ে বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার কত খেলার সাধ।"

... ...

শুধু যে বাড়ীর বাইরে যাওয়াই তাঁর বারণ ছিল তা নয়, বাড়ীর ভেতরেও সব জায়গায় যেমন-খুসী

তাঁর যাওয়া চলতো না। কিন্তু এই রকম বাঁধা-ধরার মধ্যে থেকেও তাঁর মনের মধ্যে এতটুকু আনন্দের অভাব ছিল না। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে ফাঁক-ফুকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতেন, আর তাইতে তাঁর শিশুমন উল্লাসে ভরে উঠ্‌তো। বাড়ীর ভেতরে একটি বাগান ছিল, সেটি যে খুব বড়, তা নয়। সেখানে খুব বেশী গাছপালা ছিল না। একটা বাতাবি নেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া আর এক সার নারিকেল গাছ নিয়েই ছিল এই বাগানটি। কিন্তু এই বাগানটিই ছিল তাঁর স্বর্গের বাগান। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি এই বাগানে এসে হাজির হতেন। একটি শিশির-মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটে আসতো, আর পূব দিকের পাঁচীরের উপর নারিকেল পাতার ঝালরগুলির ভেতর দিয়ে সোনালি রোদ মুখ বাড়াতে থাকতো।

দুপুরবেলা চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে পর বাহিরের দিকে চেয়ে-চেয়ে কত রকমই তিনি ভাবতেন! মাথার উপরে নীল আকাশ, রোদ একেবারে চক্‌চক্‌ করছে— আকাশের কোণ থেকে মাঝে মাঝে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক তাঁর কানে এসে পৌঁছত। রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা

"চাই, চূড়ী চাই, খেলোনা চাই" বলে হেঁকে যেতো। মাথার উপরের নীল আকাশ, চক্‌চকে রোদ, নারিকেল গাছের সারি, মাটি, জল, দূরের ঘর-বাড়ী এই সব জড়িয়ে তাঁর সমস্ত মনটাকে একেবারে উদাস করে দিত। তাঁর মনটি তখন বোধ হয় এই কথাই বলতো—

"আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে,—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে;
গরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।"

"আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকোভরা সোনামাণিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিনজনে!

আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার !"

... ...

"দাদার জন্যে আন্‌ব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া ।
বাবার জন্যে আন্‌বো আমি তুলি
কনকলতার চারা অনেকগুলি ;—
তোর তরে মা দেব কৌটা খুলি
সাত-রাজার-ধন মাণিক একটি জোড়া !"

ছোট বেলাতেই রবীন্দ্রনাথের মন কি বিচিত্র কল্পনার ভেতর দিয়েই ঘুরে বেড়াতো !

বংশ-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাপ-পিতামহ খুব ধনী ছিলেন এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁরা যে কত মহৎ ছিলেন সে কথা বলা হয় নি। এবার তা বলবো।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। ১৭৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। দ্বারকানাথের জীবনের ইতিহাস ঠিক উপন্যাসের মতো। তাঁর সমান ধনী তখনকার দিনে বাংলাদেশে আর একজনও ছিল কি না সন্দেহ। নিজের চেষ্টায় তিনি ক্রোড়-ক্রোড় টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। তাঁর উপার্জ্জনশক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তিও তেমনি অদ্ভুত ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি—

একবার এক জজ সাহেব ছুটি নিয়ে বিলাত যাচ্ছিলেন। যাবার সবই ঠিক, এমন সময় তাঁর পাওনাদারেরা তাঁকে খবর দিল যে, তাঁর লাখ টাকার উপর ধার। সে ধার শোধ না দিলে জজ সাহেবকে জেলে যেতে হবে। তিনি তখন মহাবিপদে পড়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখে সব কথা জানালেন,



দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৬—পৃঃ

আর টাকার সাহায্য চাইলেন। দ্বারকানাথ জজ সাহেবের পাওনাদারদের ডাকিয়ে সমস্ত ধার শোধ করে দিলেন আর তাদের কাছ থেকে খতের কাগজপত্রগুলি চেয়ে নিলেন। তার পর নিজে চললেন জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। জজ সাহেব যখন নিজের দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে বলতে আরম্ভ করলেন, তিনি তখন তাঁকে খতের কাগজপত্রগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে, এবার তিনি সচ্ছন্দে বিলাত যাত্রা করতে পারেন। জজ সাহেব তো অবাক্। তিনি এই টাকা ধার বলে নিয়ে খত্ লিখে দিতে চাইলেন কিন্তু দ্বারকানাথ কোন রকম খত্ নিতে রাজি হলেন না। তাঁর দানের এই রকম অনেক গল্প আছে।

দেশের কাজে তিনি লাখ-লাখ টাকা দিয়ে গেছেন। এদেশের কত ভাল ভাল কাজের তিনি গোড়া পত্তন করে গেছেন তার ঠিকানা নেই। হিন্দু কলেজ যখন খোলা হয়, তিনি তার উদ্যোগী ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের বাড়ী তৈরীর জন্য তিনি বিস্তর টাকা দিয়েছিলেন।

ইংরেজ মহলে তাঁর খুব খাতির ছিল। সকল কাজেই তিনি ইংরেজ সরকারকে পরামর্শ দিতেন।

তাঁরই পরামর্শে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি হয়। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কি, তা এখন সবাই জানে, কিন্তু তিনিই যে এর সৃষ্টিকর্ত্তা তা এখন খুব কম লোকেরই জানা আছে। দ্বারকানাথকে ইংরেজ সরকার জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ (Justice of the Peace) করে দেন, তখনকার দিনে এর চেয়ে বড় সম্মানের পদ আর কিছু ছিল না।

১৮৪২ সালে তিনি বিলাতে যান। বিলাতের ধনী আর বনেদি লোকদের ভেতর তিনি খুব খাতির পেয়েছিলেন। তাঁর ধন-দৌলত, জাঁক-জমক, রাজপুত্রের মত চেহারা, ভদ্র ব্যবহার, উঁচু মন, এই সব দেখে ইংলণ্ডের বড় বড় লোক থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাজার ঠাটে থাকতেন আর খুব খরচপত্র করতেন। এই জন্যে সেখানকার লোকেরা তাঁকে 'প্রিন্স্' এই নাম দিয়েছিল।

তোমরা হয় তো মনে করছো, দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে মিশে একেবারেই সাহেব হয়ে গেছ্লেন। তা কিন্তু নয়। সেখানে তিনি দেশী পোষাকই পরতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদা তাঁর হাতে থাকতো। সেখানকার কেউ যদি তাঁর দেশের

কোন-কিছুকে খাটো করবার চেষ্টা করতো, তিনি তা সহ্য করতেন না, সঙ্গে সঙ্গে অমনি প্রতিবাদ করতেন। নিজের দেশের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

দেশের জন্য ভাল কাজে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় বার যখন তিনি ইংলণ্ড যান, তিনি ঠিক করলেন মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে নিজের খরচায় ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে শিক্ষিত করে আনবেন। চারজন ছাত্র জুট্‌লো, তার ভেতর দুজনের খরচের ভার তিনি নিজে নিলেন। কিন্তু এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। বিলাতে তাঁর ভয়ানক ব্যারাম হয় আর সেখানেই তিনি ৫২ বৎসর বয়সে মারা যান।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, সততায়, চরিত্রের বলে মানুষের সেরা ছিলেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে যান। তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ মানুষ আর একজনও ছিল না, এ কথা বললে বেশী কিছুই বলা হোল না। তাঁর ধর্ম্মভাব এ রকম অসাধারণ ছিল যে, গুণী লোকেরা তাঁকে 'মহর্ষি' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত কথা শুনলে বহু পুণ্য লাভ হয়। ফুলের সুবাস নাকে

এলে মন যেমন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, মহর্ষির কথা শুনলেও মন তেমনি আপনা আপনি ভক্তি ও আনন্দে ভরে উঠে। তাঁর অপূর্ব্ব চরিত কথা অল্পের ভেতর বলা অসম্ভব। বড় হয়ে তোমরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে জেনো। তিনি যে কত মহৎ, কত উদার ছিলেন কেবল সেই সম্বন্ধে দু-এক কথা তোমাদের শোনাব।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বিস্তর টাকা দেনা। বিলাতে তিনি রাজার ঠাটে থাকতেন, তা ছাড়া তাঁর দান ছিল অসাধারণ রকমের। এই সব কারণে তাঁর প্রায় এক ক্রোড় টাকা দেনা হয়। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩০ বৎসর। হিসাব পত্র করে দেখা গেল, পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা, দেনা কিন্তু এক কোটি টাকা। পিতার এই দেনা কি করে তিনি শোধ দেবেন ভেবে আকুল হলেন। তিনি সকল পাওনাদারকে ডেকে পাঠালেন আর সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন। দেবেন্দ্রনাথের নিজের জন্যে কিছু সম্পত্তি তাঁর পিতা রেখে গেছ্‌লেন। এ সম্পত্তিতে পাওনাদারদের হাত দেবার কোনই অধিকার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, দেনার জন্যে তাঁর এই সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হবে না, আর এই সম্পত্তি



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২০পৃঃ

থাকলে তাঁর কিছুরই অভাব থাকবে না। কিন্তু নিজে তিনি সম্পত্তি ভোগ করতে থাকবেন, আর পাওনাদারেরা তাদের নায্য টাকা পাবে না, এ কি হতে পারে? তিনি অন্য সব বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে নিজের এই সম্পত্তিটিও পাওনাদারদের হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন। পাওনাদারেরা তো এই দেখে অবাক্। অনায়াসে তিনি এই সম্পত্তি বাঁচাতে পারেন, কিন্তু তা না করে যথা-সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করে ফকির হতে বসেছেন। তাঁর আত্মীয়েরা কত করে তাঁকে বোঝালেন, এ সম্পত্তিটিও ছেড়ে দিলে একেবারেই যে তিনি পথে বসবেন! কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কি বললেন শুনবে? তিনি বললেন, "যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ বলিতে পারিব না যে সব দিলাম। এমনি সকলই দিব। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তিনি সব দিলেন। তাঁর হাতে একটি দামী আংটি ছিল। তিনি বললেন "এই আংটিটা আমার আছে; আমার বিষয়-সম্পত্তির তালিকার মধ্যে এটাকেও ধরা উচিত।" পাওনাদারেরা তাঁর অসাধারণ সরলতা দেখে মুগ্ধ হলেন। অনেকের চোখে জল এল। আজ এঁরা রাজপুত্র, কাল কিন্তু

হবেন পথের কাঙাল। তাঁরা বুঝলেন, এঁরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। শেষে দেনা-পাওনার একটা মীমাংসা হোল। পাওনাদারেরা সমস্ত বিষয় দেবেন্দ্রনাথের হাতেই রাখলেন। ঠিক হোল, দেবেন্দ্রনাথ নিজেই সব দেখবেন আর ক্রমশ দেনা শোধ করবেন। বিপদ এই ভাবে কেটে গেল—সাধুতারই জয় হোল।

দেবেন্দ্রনাথ ধনী ছিলেন—বিষয়ী ছিলেন, কিন্তু বিষয়ের দাস ছিলেন না। তাঁর দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন বৈঠকখানায় বসে তিনি সকলকে বলেছিলেন "আজ আমি কল্পতরু হইলাম, আমার কাছে যে যাহা চাহিবে তাহাকে আমি তাহাই দিব।" এই বলে বড় বড় আয়না, সুন্দর সুন্দর ছবি, জরির পোষাক, দামী আসবাব-পত্র যা তাঁর ছিল, সব বিলিয়ে দিলেন।

একদিন একজন লোক এসে দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, "মহাশয় আপনার পিতা আমাদের দাতব্য সমিতিতে এক লক্ষ টাকা দান করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তিনি সে টাকা দিয়ে যেতে পারেন নি। আপনি এখন আমাদের সেই টাকা

দিন।” দেবেন্দ্রনাথ তখন কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। পাওনাদারদের দেনা তখনো মাথার উপর। এত টাকা দেওয়ার অবস্থা তাঁর তখন নয়। এই টাকা তিনি নাও দিতে পারতেন। না দিলে কেউ তাঁকে অপরাধী করতো না। কিন্তু তাঁর পিতা একবার যখন কথা দিয়ে গেছেন, তখন একে তিনি পিতৃ-ঋণ বলেই ধরে নিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক লক্ষ টাকা সুদসমেত সেই দাতব্য সমিতিকে দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ দান করতেন, কিন্তু নামের জন্যে নয়। যে লোককে যা দিতেন, আগে তা ঈশ্বরকে নিবেদন করে পরে তা নৈবেদ্যের মতো সেই লোককে দিতেন। কোন লোককেই তিনি ফেরাতেন না। সমস্ত জীবন ধরে তিনি অনেক দান করে যান। নানারকমের ধার শোধ করা ছাড়া তিনি প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা সমস্ত জীবনে দান করেছিলেন।

স্বদেশকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর অন্তরে দেশী ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁর কোন এক আত্মীয় একবার ইংরাজিতে তাঁকে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠি খুলে যেমন দেখলেন যে সেটি ইংরাজিতে লেখা, অমনি না পড়েই সে চিঠিখানি ফেরৎ

পাঠিয়ে দিলেন। মাতৃভাষার উপর তাঁর এমনই ছিল অসাধারণ শ্রদ্ধা।

সংসারে থাকতে হলে মানুষকে যা যা করতে হয়, তার সবই তিনি করতেন, কিন্তু তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের আরাধনা। তিনি বল্‌তেন—পরে যাতে সুখী হবে, এখন তা কর, কিন্তু অনন্তকাল ধরে যাতে সুখী হতে পার, তা আজীবন ধরে করে যাও। সুখের ভেতর, বিলাসের ভেতর থেকেও আজীবন ধরে তিনি ঈশ্বরেরই আরাধনা করে গেছেন। এ জন্যে লোক-জনের ভীড় থেকে আলাদা হয়ে নির্জ্জনে থাকতেই তিনি ভাল-বাসতেন। কখনো থাকতেন নৌকায় করে নদীতে, কখনো জনশূন্য মাঠে তাঁবু ফেলে, কখনো বা হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ায়। এই সব জায়গায় তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করেই কাটিয়ে দিতেন।

শেষ বয়সে তাঁর মন দিন-রাত ঈশ্বরে মগ্ন হয়ে থাকতো। তিনি তখন বলতেন—"এখন আমি নীড়ে মায়ের পাখার নীচে শুয়ে রয়েছি। শীঘ্রই আমার পাখা উঠবে, তখন মায়ের সঙ্গে অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াবো। এ আনন্দ আর আমার মনে ধরে না।"

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে কেবলই তিনি বলতেন "এখন আমি কেবল তাঁকেই দেখছি—তাঁকেই দেখ্‌ছি।" কখন বলতেন "আমি বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাব।"

৮৭ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ অনন্ত লোকে গমন করেন। কেমন করে, কি প্রণালীতে, বাইরের হাজার হাজার আকর্ষণ কাটিয়ে তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন, তা জানবার বিষয়। বড় হয়ে তোমরা তা জানবার চেষ্টা করো—জীবন সার্থক হবে।

লেখাপড়ায়

রবীন্দ্রনাথের পিতার কথা—পিতামহের কথা তোমরা শুনলে। তাঁরা কত বড় ছিলেন, তা দেখাবার জন্যেই তাঁদের কথা বিশেষ করে বললুম। এবার রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য জীবন বিচিত্র ছিল। বাড়ীর বাইরে যেতে না পেলেও মনে তাঁর আনন্দের অভাব ছিল না। গাছপালা, ফুলফল, পাখীর গান, মেঘ, জল এই সব দেখেই তিনি আনন্দে ভরপূর হয়ে থাকতেন। এ সমস্তই তাঁর সঙ্গে কথা কইতো। তার পর আর একটু বড় হয়ে তিনি অবশ্য তোমাদের মতোই স্কুলে যেতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাঁধাবাঁধির ভেতরে থেকে স্কুলের পড়া পড়তে তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না। স্কুলের শাসন ছিল বিদ্‌ঘুটে ধরণের। পড়া বলতে না পারলে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোত, আর হাতের উপর যত রাজ্যের শ্লেট্‌ চাপিয়ে দেওয়া হোত। দুপুর রোদে খালি পায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হোত। আর মারধোর তো ছিল কথায় কথায়।

একদিকে চাকরদের শাসন, আর একদিকে মাষ্টারদের মারধোর,—এতে তাঁর মনটিতে বেদনা লাগতো নিশ্চয়, কিন্তু তা বলে তাঁর আনন্দস্রোতে বাধা পড়ে নি। অতি সামান্য, তুচ্ছ জিনিষও তাঁর কাছে আনন্দময়, রহস্যময় ঠেক্‌তো। বারান্দার এক কোণে আতার বীচি পুঁতে রোজ তিনি জল দিতেন। সেই বীচি থেকে যে গাছ গজিয়ে উঠতে পারে এ কথা মনে করে তাঁর কতই না বিস্ময়, কতই না আনন্দ হোত। এই পৃথিবীটাকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই বরাবর দেখে আসছেন। এর ভেতরের তলাটাতে না জানি কি আছে, এই কথাটা তিনি কতদিন ভাবতেন। কি করলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙ্‌এর মলাটটাকে খুলে ফেলা যেতে পারে, তার কত প্ল্যান্‌ই ঠাওরাতেন। ভাবতেন, একটার পর একটা তার পর আর একটা বাঁশ যদি ঠুকে ঠুকে পোঁতা যায় আর এমনি করে অনেকগুলো বাঁশ পুঁতে ফেল্লে পর, পৃথিবীর নীচের তলাটার হয়তো নাগাল পাওয়া যেতে পারে। মাঘোৎসবের সময় কাঠের থাম পোঁতবার জন্যে উঠানে মাটি কাটা হোত। এই মাটিকাটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ই কৌতুকজনক ছিল। তিনি

দেখতেন, গর্ত্ত বড় হতে হতে একটু একটু করে সমস্ত মানুষটাই গর্ত্তের নীচে তলিয়ে যেত, অথচ তার ভেতর দিয়ে যে পাতালপুরীতে যাওয়া যেতে পারে তার কোনই সম্ভাবনা দেখা যেত না। তাঁর মনে হোত গর্ত্তটা যেন আর একটু বড় করলেই ঠিক হয়; কিন্তু বড়রা সে দিকে গা করতেন না দেখে তাঁর ভারী আপশোষ হোত।

স্কুলে তিনি যেতেন বটে, কিন্তু স্কুলের কোন কিছুই তাঁর ভাল লাগতো না—ছেলেদেরও না, মাষ্টারদেরও না। একজন মাষ্টারের ব্যবহার এতই মন্দ ছিল যে, তিনি তাঁর ক্লাশে সকল ছাত্রের নীচে চুপটি করে বসে থাকতেন। মাষ্টারের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতেন না। সমস্ত বছরটা এই ভাবে কেটে গেল। তার পর যখন বাংলার পরীক্ষা হোল, তিনি সকল ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পেলেন। তাঁর সেই মাষ্টারটি কিন্তু এটা মানতেই চাইলেন না। তিনি বললেন, পরীক্ষা ঠিক-মতো নেওয়া হয় নি, দ্বিতীয় বার পরীক্ষা নেওয়া হোল। এবারেও তিনি সকলের উপরে হলেন।

শুধু স্কুলের পড়াতে কি হয়! বাড়ীতে অনেক বেশী তাঁকে পড়তে হোত। চারুপাঠ, বস্তুবিচার,

প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে মেঘনাদবধ কাব্য পর্য্যন্ত। এ ছাড়া আরো অনেক কিছুই ছিল। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লঙ্‌টি পরে প্রথমেই এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হোত। তার পর সেই মাটিমাখা শরীরের উপর জামা পরে পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এই সব পড়তে হোত। স্কুল থেকে ফিরে এসেই ড্রয়িং আর জিম্নাষ্টিক্ করতে হোত, সন্ধ্যার সময় ইংরাজি পড়তে হোত; তার পর রাত্রি ন'টার পর ছুটি। রবিবার সকালে গান শিখতে হোত।

স্কুল-কলেজের পড়া বেশীদূর না এগুলেও বাড়ীতেই তাঁর শিক্ষার যা আয়োজন ছিল তা খুবই বেশী। এ বিষয়ে তিনি অনেক ছেলের চেয়েই বেশী ভাগ্যবান। আর এক মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, অনেক গুণী লোক সদাসর্ব্বদা তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তাঁদের কেউ বা কবি, কেউ বা গায়ক, কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ বা দার্শনিক, কেউ বা মহা-ধার্ম্মিক। এঁরা সকলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট খুব সমাদর পেতেন। বড় বড় পণ্ডিত—যেমন রাজ-নারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত ঠিক একেবারে তাঁদের

আপনার লোক হয়ে গেছ্‌লেন। বই পড়ে যা শেখা যায় তার চেয়ে ঢের বেশী শেখা যায় মানুষের সঙ্গ থেকে। নিজের বাড়ীতেই রবীন্দ্রনাথ যে রকম শিক্ষা পেতে লাগলেন, সে রকম শিক্ষা স্কুলেও হয় না— কলেজেও হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের আরম্ভ হয়, তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত আট বছর। এই আরম্ভটি ভারী সুন্দর। তিনি বলেছেন "আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়।··· একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।···পদ্য জিনিষটিকে এ পর্য্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি।···এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।" তারপর গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তা পদ্য হয়ে উঠলো, তখন তিনি ভারী আশ্চয্যি হয়ে গেলেন। ভয় একবার যখন ভাঙ্গলো, তখন আর পায় কে? দপ্তরখানার একজন আমলাকে ধরে অনেক কষ্টে একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করলেন আর তাতে নিজের হাতে পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো অসমান

লাইন কেটে বড বড় অক্ষরে পদ্য লিখতে স্থরু করে দিলেন।

পদ্য লিখে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অপরকে শোনান যায় ততক্ষণ কি আর মজা হয়! রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে অলস ছিলেন না। তিনি যাকে তাকে ধরে পদ্য শোনাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দাদা ছোট ভাইটির পদ্য রচনায় ভারী গর্ব্ব বোধ করলেন আর বাড়ীর সবাইকে এক ধার থেকে তা শোনাতে লেগে গেলেন। বাড়ীর সবাই তো অস্থির! শুধু কি বাড়ীর লোক! তাঁদের জমিদারী কাছারীর আমলারা পর্য্যন্ত বাদ গেল না। তাঁর সেই নীল খাতাটি বাঁকা বাঁকা লাইনে আর সরু মোটা অক্ষরে ক্রমেই বোল্‌তার বাসার মত ভরে উঠতে লাগলো। তিনি যে কবিতা লেখেন তা বাড়ীর বাহিরেও যাতে রটে যায়, এমন কি স্কুলের মাষ্টারদেরও যাতে কাণে যায় সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তোমরা এই দেখে বোধ হয় মনে মনে হাসছো। কিন্তু তোমরাও কি ঠিক এই রকমটি কর না? তাঁর তখনকার কবিতা দু-একটি শুনবে?

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা স্থখে জলক্রীড়া করে।

আমসত্ত দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

বড়দের ভেতর সমঝদার শ্রোতা তিনি খুব বেশী পেতেন না। অনেকেই আবার তাঁর কবিতা শুনে হাসতেন। একবার কেউ হাসলে, আর তিনি সেদিক মাড়াতেন না। কিন্তু শ্রোতার অভাব তাঁর মোটেই হয় নি। একটি খুব ভাল শ্রোতা তিনি পেয়েছিলেন। ইনি একজন বৃদ্ধ; নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। ইনি রবীন্দ্রনাথের পিতার একজন ভক্ত বন্ধু। এ রকম শ্রোতা আর মেলে না। ভাল লাগবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ রকমের ছিল। এই বৃদ্ধ একেবারে পাকা বোম্বাই আমটির মতো—কোথাও এতটুকুও আঁশ ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো, মুখের মধ্যে দাঁতের কোন বালাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এঁকে মনের সাধ মিটিয়ে কবিতা শোনাতেন। বৃদ্ধের স্বভাবটি ছিল ভারী মিষ্টি। মিষ্টি স্বভাবের গুণে মানুষ মাত্রেই ছিল তাঁর আপনার। সর্ব্বদাই হাসি মুখ। দিন রাত একটি সেতার তাঁর কোলে কোলেই

ফিরতো—কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না। গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর শিষ্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তাঁহার একটা গান ছিল—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।' ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন।"

বাড়ীর বাহিরে

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকতেন। তাঁর পিতা তখন বাড়ীতেই প্রায় থাকতেন না, দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াতেন। পর্ব্বত, নদী, নির্জ্জন মাঠ এই রকম সব জায়গা ছিল তাঁর অতি প্রিয়। অনেক দিন বিদেশে থাকার পর অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন তিনি কল্‌কাতায় আসতেন তখন সমস্ত বাড়ী যেন গম্ গম্ করতে থাকতো। সকলেই সাবধান হয়ে চলতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পাছে বারান্দায় গোলমাল ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্ব্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।" এই রকম ভাবে দূরে দূরে থেকেই তাঁর কৌতূহল মিটতো, পিতার কাছ অবধি আর পৌঁছানো ঘটে উঠ্‌তো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্য রকমে এই ব্যবস্থা বদলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের তখন উপনয়ন হয়ে গেছে। তাঁর মাথাটি একেবারে নেড়া। নেড়া মাথা নিয়ে স্কুলে

যাবেন কি করে, এই হয়েছে তাঁর মহা ভাবনার কথা। এমন সময় হঠাৎ একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়লো। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যেতে চান কি না। রবীন্দ্রনাথের তখন যে কি আনন্দ, তা বলে বোঝান শক্ত। তিনি বলেন, "চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত।

হিমালয়ে যাবার দিন তিনি পোষাক পরে তাঁর পিতার সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন। তাঁর বয়সে এই প্রথম তিনি পোষাক পরলেন। একটা জরির-কাজ-করা মখ্‌মলের টুপি হয়েছিল। মনে মনে আপত্তি থাকলেও সেটা তাঁকে নেড়া মাথার উপরেই পরতে হোল। এর আগে তিনি কখন রেলগাড়ীতে চড়েন নি। ষ্টেশনে পৌঁছে তাঁর বেশ একটু ভয় করতে লাগলো। কারণ তিনি শুনেছিলেন, রেলগাড়ীতে চড়া এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার—পা ফস্‌কে গেলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু অতি সহজেই রেলগাড়ীতে উঠতে পারলেন দেখে, তিনি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

তারপর গাড়ী ছুটে চল্‌লো। মাঠ, গাছপালা,

গ্রাম ঠিক যেন ছবির ঝরণার মতো রেলগাড়ীর দুদিক দিয়ে ছুটতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় তিনি বোলপুরে পৌঁছলেন। এখানে কিছু দিন তাঁদের থাকবার কথা। বোলপুর সম্বন্ধে শুনে শুনে আগে থেকেই তিনি এর এক সুন্দর ছবি মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার ঝাপ্‌সায় অল্প-স্বল্প দেখলে পাছে সকাল বেলায় দেখবার পূরোপূরি আনন্দ না পাওয়া যায়, এই ভয়ে তিনি পাল্কীতে উঠেই চোখ বুজে রইলেন।

ভোরে উঠে বোলপুরের ছবি তাঁর কল্পনার সঙ্গে হয়তো মেলে নি, কিন্তু এখানে যা তিনি পেলেন, তাইতে তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। চারদিকে মাঠ ধূ ধূ করছে। মাঠে যেখানে খুসী তিনি ঘুরে বেড়াতে পেতেন। বোল-পুরের মাঠে মাঝে মাঝে খোয়াই আছে। এই খোয়াই থেকে তিনি নানা রকমের পাথর জড় করতেন, আর সেগুলো জামার আঁচলে ভরে পিতার কাছে উপস্থিত করতেন। তা দেখে তাঁর পিতা ভারী খুসী হয়ে বলতেন —কি চমৎকার! এ সব তুমি পেলে কোথায়? রবীন্দ্রনাথ আহ্লাদে উথলে উঠে বলতেন—এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ এনে

দিতে পারি। তাঁর পিতা বলতেন, তা হলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়ে আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজিয়ে দাও।

খোয়াইয়ের ভেতর এক জায়গায় মাটি চুইয়ে একটা গর্ত্তের মধ্যে জল জমা হোত। এই গর্ত্ত ছাপিয়ে ঝির্ ঝির্ করে জল বয়ে যেতো আর গর্ত্তের মুখে ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াতো। তিনি তাই দেখে আহ্লাদে অধীর হয়ে পিতাকে এসে বলতেন, ভারী সুন্দর জলের ধারা দেখে এসেছি, সেখান থেকে আমাদের স্নানের জল আর খাওয়ার জল আনলে বেশ হয়। তাঁর পিতাও তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে সেখান থেকেই জল আনাবার ব্যবস্থা করে দিতেন।

এখানে যে তিনি শুধুই বেড়িয়ে বেড়াতেন, তা নয়, কবিতাও লিখতেন। একটি ছোট নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে রাশি রাশি কবিতা লিখে যেতেন।

বোলপুর থেকে বেরিয়ে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর এই সব জায়গা হয়ে শেষে অমৃতসরে পৌঁছলেন। অমৃতসরে মাসখানেক থেকে ড্যালহৌসি পাহাড়ে গেলেন। তাঁদের থাকবার জায়গা

ঠিক হয়েছিল একটি পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় এখানেও তিনি নিজের মনে যেখানে খুসী যখন বেড়িয়ে বেড়াতেন। তাঁদের বাসার নীচের পাহাড়ে ছিল মস্ত এক কেলুবন। এই বনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ বিরাট দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে কত শত বৎসর ধরে যে দাঁড়িয়ে ছিল তার ঠিক নেই। গাছগুলোর গা ঘেঁসে বেড়াতে তাঁর একটুও ভয় করতো না। তিনি লম্বা একগাছা লাঠি নিয়ে প্রায়ই এই বনে বেড়াতে যেতেন।

শুধু খেলা আর বেড়িয়ে বেড়ানো নয়। তাঁর পিতা তাঁকে লেখাপড়াও শেখাতেন। এখানে সব কাজই তাঁকে নিয়ম ধরে করতে হোত, যদিও তার ভেতর বাঁধাধরার ভাব ছিল না।

খুব ভোরে তাঁর পিতা তাঁকে ঠেলে তুলে দিতেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার থাকতো; সেই পাহাড়ের শীতে কম্বলের মুড়ি থেকে বেরিয়ে তত ভোরে তাঁকে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করতে হোত।

সূর্য্য উদয়ের সময় তাঁর পিতা তাঁকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতেন। তার পর তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। বেড়িয়ে ফিরে এসে ঘণ্টাখানেক

ইংরাজি পড়া চলতো, তার পর বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। এই স্নান তাঁর বড়ই কষ্টের ছিল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর পিতা তাঁকে আর একবার পড়াতে বসাতেন। কিন্তু তখন যত রাজ্যের ঘুম এসে হাজির হোত। ঘুমে তিনি কেবলই ঢুলে পড়তেন। তাঁর অবস্থা বুঝে তাঁর পিতা তাঁকে ছুটি দিতেন। ছুটি পাওয়া মাত্রেই ঘুম কোথায় ছুটে পালাতো, তার পর লাঠি হাতে করে এক পাহাড় হতে আর এক পাহাড়ে ছুটোছুটির পালা সুরু হোত।

এমনি করে মাস কয়েক কাটলে পর তাঁর পিতা একজন লোকের সঙ্গে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ীর শিক্ষা

হিমালয় থেকে ফিরে এলে পর বাড়ীতে আর আগেকার ভাব রইলো না। চাকরদের শাসন গেল। বাড়ীর ভেতর যেখানে খুসী যাবার অধিকার পেলেন। তাঁর মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন তিনি দখল করে বসলেন। তার পর গল্প আর গল্প—দিনরাত কেবল ভ্রমণের গল্প। ছাদের উপর সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মায়ের বায়ু সেবনের সভায় তিনিই হলেন প্রধান বক্তা। তাঁর মা তাঁর মুখে ভ্রমণের গল্প শুনে শুনে ভারী খুসী হতেন।

বাড়ীর শাসনও যেমন ভেঙ্গে গেল, স্কুলে যাবার টানও তাঁর তেমনি কমে আসতে লাগলো। স্কুলের আইন-কানুন যা, তাতে সেটাকে ঠিক জেলখানা বা হাঁসপাতাল বলেই তাঁর মনে হোত। কিছুতেই তিনি নিজকে এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। ছেলে-বেলার এই কথা মনে করে বড় হয়ে তিনি বোলপুরে নিজের মনের মতো করে এক স্কুল করেন। কড়াক্কড়ির ভেতর ছেলেদের মন কি রকম মুস্‌ড়ে থাকে তা নিজে তিনি ভাল রকম বুঝেছিলেন বলেই এই স্কুলটি

তিনি বসান। বোলপুরের তাঁর এই স্কুলের কথা সবাই জানে। এ সম্বন্ধে বিশেষ করে পরে তোমাদের বলবো।

বার বছর বয়সের সময় তাঁর মা মারা গেলেন। এর পর তাঁকে স্কুলে পাঠানো একেবারেই শক্ত হয়ে উঠলো। স্কুলের পড়ায় যখন কিছুতেই তাঁকে বাঁধতে পারা গেল না, তখন বাড়ীতেই ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থা হোল। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলা বাড়ীতেই তিনি পড়তে লাগলেন। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলেও পড়ার তাঁর বিরাম ছিল না। এমন কোন বাংলা বই তখন ছিল না, যা তিনি তত ছোটবেলাতেই ভাল করে পড়ে ফেলেন নি। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে এক বিষয়ে তাঁর খুব বেশী ঝোঁক ছিল, সেটি হোল কবিতা রচনা। তাঁর বয়স যত এগুতে লাগলো, কবিতা-চর্চ্চাও তত বেড়ে চল্‌লো। শুধুই কি কবিতা! যেমন কবিতা-চর্চ্চা, তেমনি গান-চর্চ্চা। তাঁদের বাড়ীতে দিনরাত গানের হাওয়া বইতো বললেই চলে। গান শুনে শুনে আর লিখে লিখে তাঁর মন গানের রাজ্যেই ঘুরে বেড়াতো।

অনেক গুণী লোক তাঁদের বাড়ীতে যাওয়া আসা

করতেন এ কথা আগেই বলেছি। তাঁর দাদারাও ছিলেন সবাই গুণী। তাঁরা সাত ভাই। রবীন্দ্রনাথ সকলের ছোট। সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে করলে ভাইবোনে তাঁরা আরো অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের এক জায়গায় রূপক করে তাঁর গুণী-ভাইদের পরিচয় বেশ সুন্দরভাবে দিয়েছিলেন,—

"ভাতে যথা **সত্য হেম,** মাতে যথা **বীর**
গুণ জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা **সোম** আর **রবি**
সেই **দেব**-নিকেতন আলো করে কবি॥"

এঁদের বাড়ীটি সত্যই একটি দেব-নিকেতন—গানবাজনা, হাসিগল্প, নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে সদাই ভরপূর থাকতো। কত লোকের যে আনাগোনা ছিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই বৃহৎ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সবাই গুণী, অনেকেই এঁরা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাটক অভিনয়ে এঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি ও দার্শনিক।

সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।



রবীন্দ্রনাথের গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

সুর-সংযোজন—৪২ পৃঃ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ওস্তাদ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী শিক্ষায় ও জ্ঞানে বাংলার মেয়েদের গৌরব। অবনীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। এ দেশে ছবি আঁকার ধারা বদলে দিয়ে নিজে তিনি এক নূতন ধারার সৃষ্টি করেছেন। এঁদের বাড়ীটি গুণি-লোকের, জ্ঞানিলোকের তীর্থস্থান বল্‌লেই চলে।

আর একটি খুব বড় জিনিষ এঁদের বাড়ীতে ছিল, সেটি হোল স্বাদেশিকতা। স্বদেশের উপর রবীন্দ্রনাথের পিতার একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, সে কথা বলেছি। এই স্বদেশপ্রীতির ভাবটি তাঁর বাড়ীর অপর সকলের মধ্যেও জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের দাদারা সকলেই স্বদেশের ভক্ত ছিলেন। অথচ সে যুগটাকে মোটেই স্বদেশী যুগ বলা যেতে পারে না। তখন ইংরাজির দিকেই সকলের ঝোঁক। দেশের ভাব আর দেশের ভাষা এ দুটোই তখন দেশের লোকের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দাদারা তখনকার দিনে স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে যে রকম মাতামাতি করতেন তা দেখলে ভারী আশ্চর্য্য হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক স্বদেশী সভা করেছিলেন। একটা গলির মধ্যে এক পোড়ো

বাড়ীতে সেই সভা বস্‌তো। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছিলেন তার সভাপতি। রাজনারায়ণ বসুর মতো পণ্ডিত তখনকার দিনে অল্পই ছিল। তাঁর তখন চুল দাড়ি সবই প্রায় সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু পাকা চুল আর পাণ্ডিত্য নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে তিনি ঠিক ছেলের মতোই মিশে যেতেন আর ছেলেদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতেন—

> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁরা সব দুপুর বেলায় বাড়ী থেকে বেরুতেন আর চুপি চুপি সভা করতে যেতেন। সভার কাজও হোত চুপি চুপি। সভার উদ্দেশ্য ছিল দেশী শিল্পের উন্নতি করা আর কলকারখানা বসানো। কলকারখানা নিয়ে ভারী মজার মজার ব্যাপার ঘট্‌তো।

একবার সকল সভ্য একমত হয়ে ঠিক করলেন, স্বদেশী দেশালাই তৈরী করতে হবে। অনেক চেষ্টা করে, অনেক পরীক্ষা করে কয়েক বাক্স দেশালাই তৈরী হোল। কিন্তু এক এক বাক্সে এ রকম খরচ

পড়তে লাগলো যে সে খরচে গোটা একটা পাড়ার পূরো এক বছর ধরে উনুন. ধরান চল্‌তো। তা ছাড়া সামান্য একটু অসুবিধা এই ছিল যে, কাছে-পিঠে আগুন না থাকলে সে দেশালাই জ্বালাতে পারা যেতো না। এই ধরণের আরো কত মজার কাণ্ড ঘট্‌তো।

তাঁদের বাড়ীর চেষ্টায় 'হিন্দুমেলা' বলে একটি মেলার আয়োজন হয়। এই মেলাতে দেশী শিল্প ব্যায়াম দেখান হোত, দেশের সাহিত্য আর সঙ্গীতের চর্চ্চা হোত আর দেশী গুণী লোকদের পুরস্কার দেওয়া হোত। রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দুমেলায় একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেশের প্রতি অনুরাগের একটি কবিতা পড়েছিলেন। এই হিন্দুমেলা আমাদের দেশের একটি প্রধান ঘটনা। আমাদের এই দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে ধারণা করবার চেষ্টা এই প্রথম। এই থেকে দেশের মধ্যে স্বদেশী আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হয়।

সব রকমেই এঁরা দেশের আদর্শ। কলিকাতার ভদ্র আর শিক্ষিত সমাজের চাল-চলন, আদব-কায়দা এঁদের আদর্শেই তৈরী হয়। শিল্পে, নাটকে, কাব্যে, সাহিত্যে এঁরাই দেশকে সব চেয়ে বেশী ধন্য

করেছেন, এ-কথা বল্‌লে বেশী কিছুই বলা হোল না। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে এঁরাই সব রকমে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। 'ভারতী' পত্রিকা অনেকেই তোমরা দেখেছ। এখন যে-সব বড় বড় মাসিক পত্র তোমরা দেখতে পাও, 'ভারতী' হোল তার ভেতর সব চেয়ে পুরাতন। পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাগজ চল্‌ছে। রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে এই কাগজ বার করেন। ভারতী বার করে এঁরা নিজেদের বাড়ীতেই সাহিত্যের একটি চমৎকার আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ছিল এক মস্ত সুযোগ। ভারতীতে তিনি মহা উৎসাহে লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কবিতা, গান, কাব্য, নানা রকমের প্রবন্ধ ভারতীতে বেরুতে লাগলো। সে সময় তাঁর বয়স ঠিক ষোল। তাঁর সেই বয়সের বিস্তর কবিতা পৃথিবীর সেরা কবিতা বলে গণ্য হয়েছে।

বিলাতে

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো, তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ বল্‌লেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে যাবেন। তাঁর পিতাও এতে মত দিলেন। বিলাত যাবার কথায় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন, এ যে একেবারে আশাতীত!

বিলাত যাবার আগে তিনি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদ গেলেন। তিনি ছিলেন সেখানকার জজ। এখানে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এ দেশের প্রথম সিভিলিয়ান। তাঁর আগে আর কেউ বিলাতে গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসেন নি। আমেদাবাদে শাহিবাগে ছিল জজের বাসা। এটি ছিল বাদ্‌শাহি আমলের এক প্রাসাদ। বাদশাহের জন্যেই এই প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল। প্রাসাদের গা ঘেঁসে সাবরবতী নদী তর্‌তর্‌ করে বয়ে যাচ্ছিল। নদীর তীরেব দিকে প্রকাণ্ড এক খোলা ছাদ। রবীন্দ্রনাথের বৌদিদি ছেলেদের নিয়ে তখন বিলাতে। তাঁর মেজদাদা আদালতে চলে গেলে পর তত বড় বাড়ীতে তিনি ছাড়া আর কেউ

থাকতো না। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা তাঁর কাছে বড়ই রহস্যময় ঠেকতো। মহা কৌতূহলে তিনি এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। বড় বড় অক্ষরে ছাপা ছবিওয়ালা অনেক ভাল ভাল ইংরাজি বই ঘরের দেওয়ালে খোপে খোপে সাজানো ছিল। এই হোল তাঁর সঙ্গী। তিনি এর ছবিগুলি বারবার দেখতেন। শেষে পড়া সুরু করে দিলেন। কতক বুঝতেন, কতক বুঝতেন না ; কিন্তু তাতে তাঁর পড়ার কোন বাধা হোত না। এই রকম করে এখানে তাঁর ইংরাজি পড়া আপনা-আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেল।

এখানে কয়েক মাস থেকে তিনি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাত্রা করলেন। তাঁর বয়স এই সময় সতের। এত অল্প বয়সে বিলাত যাওয়ার ফল তাঁর পক্ষে খুবই ভাল হয়েছিল। ছোট বেলায় ঘরের গণ্ডির ভেতর বন্ধ থেকে থেকে, যা কিছু বিদেশের, যা কিছু দূর দেশের, তাই তাঁর মনকে খুব বেশী রকম করে টেনে নিত। এতে তাঁর মনটি এ রকমের তৈরী হয়েছিল যে, যা কিছু ভাল—তা স্বদেশের হোক্, বিদেশের হোক্ চট্ করে তা তাঁর মনের সঙ্গে গেঁথে যেতো। বিলাতে যাবার আগে সে দেশ সম্বন্ধে খুব বড় একটা ধারণা

তিনি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে সে দেশটা তাঁর কি রকম লেগেছিল, তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বেশ ভাল রকম জানা যায়। সে কথা এবার তোমাদের বল্‌ছি। তা ভারী চমৎকার।

বিলাত যাবার পথে তিনি প্রথমে ইটালিতে যান। ইটালিতে পৌঁছে তিনি তাঁর দাদাকে লিখলেন—

> এই ত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক। মনে করেছিলেম, য়ুরোপে পৌঁছেই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে।…কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য রাজ্যের প্রায় বনে না।… কোন নূতন দেশে আসবার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বোলে মনেই হয় না।…য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি।

ইটালী থেকে যান প্যারিসে। ভারী জম্‌কাল সহর এই প্যারিস। সেখান থেকে লিখ্‌লেন—

> সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কি জম্‌কাল সহর!…মনে হয়, প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হোল, এই সাড়ে তিন হাত

> মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জম্‌কালো বাড়ীগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক সেই। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

বিলাতে পৌঁছে প্রথমটায় তিনি ভারী নিরাশ হলেন। তিনি ধারণ করে রেখেছিলেন ইংলণ্ড এতটুকু একটু দ্বীপ আর এই দ্বীপের এ-ধার থেকে ও-ধার পর্য্যন্ত বড় বড় কবিদের কবিতায় আর বড় বড় পণ্ডিত-দের বক্তৃতায় দিনরাত তোলপাড় হচ্ছে, আর তিনি এই দু-হাত জায়গার যেখানেই থাকুন না কেন, তা শুনতে পাবেন। তিনি ভেবেছিলেন, সেখানে সকলেই নানা রকম বিদ্যার আলোচনাতে দিনরাত মগ্ন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি দেখ্‌লেন মেয়েরা বেশ-ভূষা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চল্‌ছে। তাঁর ধারণার সঙ্গে কিছুই

মিললো না দেখে তিনি হতাশ হলেন। সেখানকার ভীড়ভাড় আর বাইরের আড়ম্বর তাঁর কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেক্‌লো। তিনি বল্‌ছেন—

ইংলণ্ডে এলে সকল চেয়ে চোখে কি পড়ে জান? লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্‌হুস্‌ কোরে চোলেছে, পাশের লোকদের ওপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্তভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। এখানে যে কত রেলওয়ে আছে তার ঠিকানা নেই, সমস্ত লণ্ডনময় রেলওয়ে—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেণ যাচ্চে।···দেশ ত এই একরত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু-পা চল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেণ যে কেন ভেবে পাইনে!······এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়—কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বোসে থাক্‌বার যো নেই—একে ত আমাদের দেশের মত এদেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি কোরতে হয়—প্রথমতঃ, শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তারপরে কম খেলে এদেশে বাঁচবার যো

> নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খেতে হয়; ······আমাদের বাংলার খাওয়া নাম মাত্র; কাপড় পরাও তাই।

এখানকার সমাজের চালচলন আর ব্যবহার প্রথমটায় তাঁর ভাল লাগেনি। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রইলো না। এখানে থাকতে থাকতে এখানকার যা ভাল, তা একে একে তাঁর চোখে পড়তে লাগলো। সব চেয়ে তাঁর ভাল লাগলো এখানকার স্বাধীনতা। আমাদের দেশের লোকজনের ভেতর কেমন একটা অবসন্ন ভাব —কারো ভেতর যেন স্ফূর্ত্তি নেই। কিন্তু এখানকার ছেলেপিলে, এখানকার লোকজন দেখে তাঁর ভারী ভাল লাগলো। তিনি তাঁর দাদাকে লিখলেন—

> এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমানভাবে রাখে।···এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা হয় ত তুমি না দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে না।···এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ

আজ্ঞা পালন করতে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীনভাব কোথা থেকে আসবে? ...আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ।

সাহেবিয়ানা জিনিষটাকে রবীন্দ্রনাথ একবারেই অপছন্দ করেন। বিলাতে গিয়ে তিনি সাহেব হয়ে যান নি। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে তিনি বিলাতে বরাবর দেশী পোষাকই পরতেন। এর দরুণ তাঁকে কত যে হাসি-ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। তিনি বল্‌ছেন—

আমাদের দিশি কাপড় দেখে, রাস্তায় এক একজন সত্যি সত্যি হেসে উঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ী চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে। তারা আমাদের দিকে এত হাঁ করে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ী আস্‌চে হুঁস্ নেই। ইস্কুলের ছোকরা এক একজন আমাদের মুখের ওপর হেসে উঠে, এক একজন চেঁচাতে থাকে—Jack, look at the blackies. কিন্তু আমি সে সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

বিলাতে পৌঁছে অল্পদিনের ভেতর সেখানকার এক

স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হলেন। স্কুলের ছেলেরা তাঁর সঙ্গে কিছুমাত্র খারাপ ব্যবহার করে নি। অনেক সময়ে তারা তাঁর পকেটের মধ্যে কমলালেবু, আপেল এইসব গুঁজে দিয়ে ছুটে পালাতো। তিনি বিদেশী বলেই তারা বোধ হয় এই রকম ব্যবহার করতো।

সেখানকার শিক্ষকদের তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তাঁদের শিক্ষার ভেতর প্রাণের যোগ ছিল। এ জন্য তিনি এঁদের শ্রদ্ধা করতেন।

বিলাতের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও তাঁর ভাল ধারণা হয়েছিল। তিনি বল্‌ছেন—

> একবার শীতের সময়…আমি দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন" বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

এই রকমের আর একটি ঘটনাও তিনি বলেছেন—

> …ষ্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়ীতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ীর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

দেশে ফিরিবার কয়েকমাস আগে তিনি ডাক্তার স্কট্ নামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ছিলেন। এই বাড়ীর চাল-চলন তাঁর বড়ই ভাল লেগেছিল,—এঁরা ঠিক যেন নিজেরই লোক। এঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এঁদের এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর বাড়ী ফিরবার সময় হোল। দেশের আলো, দেশের বাতাস তাঁকে ভেতরে ভেতরে ডাক দিচ্ছিল। এঁদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মিসেস্ স্কট্ তাঁর হাত দুখানি ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—এমনি করেই যদি চলে যাবে, তবে এত অল্প দিনের জন্য তুমি এলে কেন?

রবীন্দ্রনাথ এক বছর পরে বিলাত থেকে ফিরলেন। বিলাতের মাটিতে পা দিয়ে সেখানকার লোকজন আর সে দেশের চালচলন গোড়ায় তাঁর ভাল লাগেনি বটে, কিন্তু যখন তিনি দেশে ফিরলেন তখন অনেক জিনিষ শিখে, আর সে দেশের লোকজনের উপর বেশ একটি শ্রদ্ধা মনে মনে পোষণ করে দেশে ফিরলেন। সে দেশ থেকে যা তিনি নিয়ে এলেন, তার ভেতর সব চেয়ে বড় একটি জিনিষ ছিল, সেটি হোল মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা। দেশের হোক্ বা বিদেশের হোক্ মানুষের প্রকৃতি, মানুষের মন সব দেশেই সমান।—এ-দেশ, ও-দেশ সব জায়গাতেই সমস্ত মানুষের মন এক। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জগতে সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ এই সত্যটি তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে গেল।

মিলনের সুর

বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতার মধ্যে ডুব দিলেন। কবিতা চর্চ্চা আর গান চর্চ্চা ছাড়া অপর কোনই কাজ আর তাঁর রইলো না। তিনি কখনো বা সমুদ্রের ধারে, কখনো পাহাড়ে, কখনো বা নৌকায় গঙ্গার উপর বাস করতে লাগ্‌লেন। এই সময়টা ঘরের কোণে, চুপটি করে বসে থাক্‌বার মতো তাঁর মনের অবস্থা নয়। কেবলই তাঁর মনে হোত—

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে'
জীবন-উচ্ছ্বাসে।
... ...
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে
গুপ্ত গৃহ-বাসে।

এই রকম উন্মত্ততার ভেতর দিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। কবিতার আর বিরাম নেই—গানেরও বিরাম নেই। গানের সুর অনবরত তখন তাঁর কণ্ঠে লেগে থাকতো। প্রহরের পর প্রহর গান গেয়েও তাঁর ক্লান্তি বোধ হোত না। তাঁর কণ্ঠের গান যে কি মধুর তা যে শুনেছে, সেই জানে। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি ভারী সুন্দর। রবীন্দ্রনাথেরই মুখে তা শোন—

> একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি কতকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম।…পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল। গান গাওয়া যখন শেষ হইল তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।



বাল্মীকির ভূমিকায়—রবীন্দ্রনাথ

এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যখন ছিলেন, সেখানেও তাঁর গান চর্চ্চা আর কবিতা চর্চ্চা বন্ধ ছিল না। গানের জন্য বিলাতের ভদ্রসমাজে তাঁর খুব আদর হয়েছিল। তিনি বিলাতী গানও বেশ আয়ত্ত করেছিলেন। দেশে ফিরে দেশী আর বিলাতী সুর মিলিয়ে তিনি এক গীতিনাট্য লিখলেন—তার নাম 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। এই বাল্মীকি-প্রতিভা তাঁদের বাড়ীতে অভিনয় হয়—নিজে তিনি বাল্মীকি সেজেছিলেন। তাঁর বয়স তখন বাইশ বছর, সে সময় তাঁর বিয়ে হয়।

তাঁর তখনকার দিনগুলি ছিল আনন্দের দিন, নির্ভাবনার দিন। এই বিশ্বসংসারের সব-কিছুই তখন তাঁর কাছে সুন্দর—তাঁর মন তখন আনন্দে একেবারে ভরপূর। ছোট শিশু যেমন ধূলো, বালি, ঝিনুক, শামুক, যা খুসি তাই নিয়ে খেলতে পারে আর তাতেই তার আনন্দ উথলে উঠে, তিনিও তেমনি চোখের সামনে যা দেখতেন, তারই সঙ্গে নিজের মনের সুর মিলিয়ে দিতেন। রাস্তা দিয়ে মুটে মজুর চলে যাচ্ছে, মা ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা গরু

আর একটা গরুর গা চেটে দিচ্চে,—এ সকল তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! এ সব তো তোমার আমার চোখের সামনে দিনরাত ঘট্‌ছে, আমরা তা দেখেও দেখি না। কিন্তু এই সব তুচ্ছ জিনিষই তাঁর মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়ে দিত, তা আর বলা যায় না! কি রকম তা শুনবে? তিনি গাইছেন,—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
... ...
পরাণ পূরে গেল, হরষে হোল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
... ...
প্রভাত হল যেই, কি জানি হল এ কি!
আকাশপানে চাই, কি জানি কারে দেখি!

রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরের এই যে সুর, এইটিই হোল বিশ্বজগতের মিলনের সুর। তাঁর সমস্ত গান আর কবিতার ভেতর দিয়ে এই সুরটিই ক্রমশ বেজে উঠ্‌তে লাগলো। জীবনের পথে যেমন-যেমন তিনি এগিয়ে চললেন, এই মিলনের সুরও তেমনি উঁচু হোতে আরো উঁচু পর্‌দায় উঠ্‌তে লাগলো। মিলনের গান গাওয়াই হোল তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। তিনি গাইলেন—

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

... ...

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

এই রকম শুধু গান গেয়ে-গেয়েই তাঁর জীবনের তিরিশটি বছর কেটে গেল। বাকি জীবন বোধ হয় তাঁর এমনি ভাবেই কেটে যেতো, কিন্তু তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সময় তাঁর উপর জমিদারি কাজ দেখবার ভার দিলেন। কাজকর্ম্মের নামে প্রথমটায় তাঁর ভয় হোল, কিন্তু পিতার আদেশ। শেষে তিনি রাজি হয়ে তাঁদের জমিদারি শিলাইদাতে গেলেন।

শিলাইদা অতি সুন্দর স্থান। প্রকাণ্ড পদ্মানদী পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। খোলা মাঠ, খোলা আকাশ। সহরের গোলমাল এখানে নেই। জায়গাটি তাঁর বড়ই ভাল লাগলো। সব চেয়ে ভাল লাগলো পদ্মা। তিনি নৌকোতে করে পদ্মার উপরেই বাস করতে লাগলেন। নৌকোতেই শোয়া, বসা, ঘুমানো, খাওয়া, কাজ-কর্ম্মকরা—অর্থাৎ নৌকোই ছিল তাঁর বাড়ী। শুধু থাকা নয়, নৌকোয় করে প্রায়ই তিনি বেড়াতেন। ছোট-খাট গ্রাম, ভাঙা-চোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাখারির বেড়া দেওয়া গোলাঘর, বাঁশ ঝাড়, আম, কাঠাল, কুল, খেজুর, সিমুল, কলা, আকন্দ, ওল, কচু, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, ধানের ক্ষেত এই সকলের পাশ দিয়ে নৌকোয় করে

বেড়িয়ে বেড়িয়ে সত্যিকারের বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোতে লাগলো। তা ছাড়া আর এক জিনিষ তিনি এখানে পেলেন,—সে হোল বাঙলা দেশের মানুষ।

কাজের নামে গোড়াতে তাঁর ভয় হয়েছিল বটে, কিন্তু কাজের ভেতর গিয়ে পড়াতে, সে ভাব আর রইলো না। জমিদারির কাজে অল্পদিনেই তিনি পাকা হয়ে উঠলেন। গরীব প্রজাদের দুঃখের দুঃখী হয়ে কিসে তাদের ভাল হবে সেদিকে তিনি মনোযোগী হলেন। তাঁর কাব্যজীবন আরম্ভ হয়েছিল শিশুকালেই, এবার থেকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হোল।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে তাঁর কবি-মন সংসারকে কি চোখে দেখতে লাগলো, তার কয়েকটি ছবি এবার তোমাদের সামনে ধরতে চাই। সেগুলি অতি অপূর্ব্ব। কবির নিজের কথাতেই তা শোনাই। তিনি কি বল্‌ছেন শোন—

যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়চে। কর্ম্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই

জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করচি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা ; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিষ চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে।...

* * *

আমি বিকেলে সন্ধ্যার দিকে...অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্ব্বদিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর এক রকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে—আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠ্‌চে—আমি নতুন প্রাণ এবং নতুন বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়চে।...

* * *

ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্য্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্য্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই।...আমার মনে হয়

এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্চে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারচিনে।···

পল্লীগ্রামের লোকজন আর তাদের সাধাসিধে চাল-চলন বড়ই তাঁর ভাল লাগলো—

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিংবা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত তাই করচে।···বাস্তবিক, বড় বড় উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোট ছোট কর্ত্তব্য-সমাধাদ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে।···

*　　*　　*

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্চে···নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেচে,···তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপরে চাষারা চাষ

করচে এবং মাঝে মাঝে গরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্চে—আমার বামপারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচ্‌চে, জল তুলচে, স্নান করচে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করচে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠচে আবার ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়চে।…

* * *

দুপুরবেলাটা বেশ লাগে।…ছোট ছোট ধানের গাছ্‌গুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপচে—পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবচ্চে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করচে।…বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড় হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করচে—নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়চে—অনেকক্ষণ ধরে এই নৌকোপারাপার দেখতে বেশ লাগে। ওপারে হাট; তাই খেয়া নৌকোয় এত ভীড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপ্‌ড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্চে এবং হাট থেকে ফিরে আসচে।…

* * *

এই সমস্ত…অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড় একটি কোমল মাধুর্য্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি

দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা স্থখ আছে।···এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না।··· সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।···

পদ্মার উপর তাঁর অসাধারণ টান। পদ্মার কথা তিনি কত রকমে কতভাবে যে বলেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না।

* * *

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্ত্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর কারো কোনো অধিকার নেই।···যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুসি পড়ি, যত খুসি লিখি, এবং যত খুসি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।···বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি

পদ্মা, আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশী পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম ;—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।…

* * *

খানিকরাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে।…নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে জেগে উঠেছে আর সবসুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কতরকমের বিচিত্র শক্তি অবিশ্রাম চল্‌চে ; খানিকটা কাঁপচে, খানিকটা টল্‌চে, খানিকটা ফুল্‌চে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়চে—ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করচি।…

* * *

নির্জ্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্চে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেক্‌চে সে আর কি বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড় পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হল। সেও বল্লে "এই যে!" আমিও বল্লুম "এই যে!" তার পর দুজনে পাশাপাশি বসে আছি, আর কোন কথাবার্ত্তা নেই।…

পদ্মার উপর তাঁর ভালবাসার আর সীমা নেই। শেষে তিনি প্রাণের আবেগে বল্‌ছেন—

হে পদ্মা আমার!
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
... ...
কতদিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
... ...
কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউঝাড়,
কত বালুচর, কত ভেঙে-পড়া পাড়,
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
... ...
আর বার সেই তীরে, সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখা-শুনা তোমায় আমায়?

আর এই সমস্ত ব্যাপারের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের বাংলা মায়ের যে সুন্দর ছবিটি দেখেছেন তার তুলনাই নেই—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

পারে না বহিতে নদী জল-ধার ;
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

... ...

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

গানের রাজা

এক একজন মানুষ এক এক রকম কাজের অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। রবীন্দ্রনাথ ধনবান। বড় জমিদার। কিন্তু ধনের হেপাজত করা বা জমিদারি নিয়ে থাকাই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ নয়। অপর কোন একজন সাধারণ মানুষের জীবনে এ সকলের সংযোগ হলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেতো,—সে মনে করতো জগতে আর কিছুই তার করবার নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সকল অতি তুচ্ছ—এগুলো কেবল এক একটা অবলম্বন মাত্র। ধন-সম্পদ আর পদ-গৌরবকে উপলক্ষ্য করে তাঁর জীবন ক্রমাগত বড়র দিকেই এগিয়ে চললো।

আগেই বলেছি, পল্লীগ্রামে এসে রবীন্দ্রনাথ একেবারে সমস্ত বাংলাদেশকে পূরোপূরিভাবে পেলেন। শুধু কেবল বাংলাদেশকে পাওয়া নয়, সমস্ত পৃথিবীটাকেই তিনি এই সঙ্গে পেয়ে গেলেন বলতে হবে। কি রকম ভাবে পেলেন, তা তাঁর নিজের কথাতেই শোন—

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ,

> কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে কিন্তু এমন কোমলতা, দুর্ব্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ-দুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে কোরে এনে দিয়েছে।......আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি।......স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর বেশী ভালবাসি।...

এই ভালবাসার কি তুলনা আছে! এই পৃথিবীর গাছ-পালা, নদী, মাঠ, লোকজন সবাই তো দেখে, কিন্তু দেখে এমন করে ভালবাসে কজন ?

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গেও তিনি যেতে চান না। তাই তিনি বলেছেন—

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।

তাঁর এই ভালবাসা কত বিচিত্র ভঙ্গিতে যে প্রকাশ পেয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। পদ্মা যেমন চল্ চল্ ছল্ ছল্ করে অবিশ্রান্ত চলেছে, তাঁর প্রাণের ভাবও তেমনি নানা ছন্দে, নানা তালে ফুটে উঠেছে—অফুরন্ত গানে আর অজস্র কবিতায়,—পদ্মার জলধারার মতো তার আর বিরাম নেই।

তিনি গানে আর কবিতায় আমাদের এই মাতৃভূমিকে কত ভাবেই না পূজা করেছেন !

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥

... ...

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।

তোমরা তাঁর "কথা" কাব্যটি পড়েছ নিশ্চয়। এই "কথা" কাব্যের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের বীরপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী কি চমৎকার করেই তিনি বলেছেন। শুনলে মন একেবারে মেতে ওঠে। তার এক-আধটি মনে করিয়ে দিই। তোমাদের অনেকেরই হয় তো মুখস্থ আছে,—

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্—
নির্ম্মম নির্ভীক্।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ্
নূতন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্ণিমিখ্।
... ...
পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কিরে!
লক্ষ বক্ষ চিরে

ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরা'ল
পঞ্চনদীর তীরে।

তাঁর কবিতা আর গান রূপ ধারণ করে আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তাঁর এক একখানি বইয়ে। যেমন—সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, খেয়া, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা—আর কত নাম করবো! এই সকল বই যে কি অমূল্য সম্পদ আমাদের মধ্যে বিতরণ করছে, তা বুঝতে পারাও মহা ভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্প আর এক অপূর্ব্ব জিনিষ। কবিতায় আর গানে যেমন তিনি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, ছোট ছোট গল্পে তেমনি তিনি সমস্ত মানুষের মনের কথা বলেছেন। অনেকেই তোমরা তাঁর ছোট ছোট গল্প পড়ে থাকবে। সে গুলি যে কত চমৎকার, সে কথা কি আর বলতে হবে? তাঁর উপন্যাস আর নাটক এত উঁচুভাবের যে, তা আমাদের

সাহিত্যের ধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। আর তাঁর গানের তো তুলনাই নেই। রবীন্দ্রনাথের গান সারা বাংলা দেশকে ছেয়ে রেখেছে। তাঁর গান আমাদের মাঠে ঘাটে রাখাল বালকেরা গেয়ে বেড়ায়। সভায়, মজলিসে তাঁর গান না হলে লোকের আনন্দ হয় না। দেশের পূজায় তাঁর গানেরই স্থান সকলের আগে। গান দিয়ে তিনি বাংলা দেশকে আর বাঙালীকে মুগ্ধ করে রেখেছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

এতে এমন কে আছে যে আনন্দে নেচে উঠে না! আর—

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে ॥

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি,
ধর গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি ল'য়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥

এই শঙ্খ-রব শুনে এমন কে আছে যে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে পড়তে চায় না।

মায়ের ডাকে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে তিনি যেমন করে মিলিয়েছেন, তেমনটি আর কি কেউ পেরেছে?

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে॥
... ...

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥
মান অপমান গেচে ঘুচে,
নয়নের জল গেচে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥

বাংলার ভাইবোনকে কি সুন্দর করেই না তিনি এক করেছেন !

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

কিন্তু শুধু কি তিনি বাংলারই কবি ! শুধু কেবল বাংলার ভাই বোনকেই কি তিনি এক করতে চেয়েছেন ? তা নয়। সমস্ত জগৎটাই যে তাঁর আপনার !

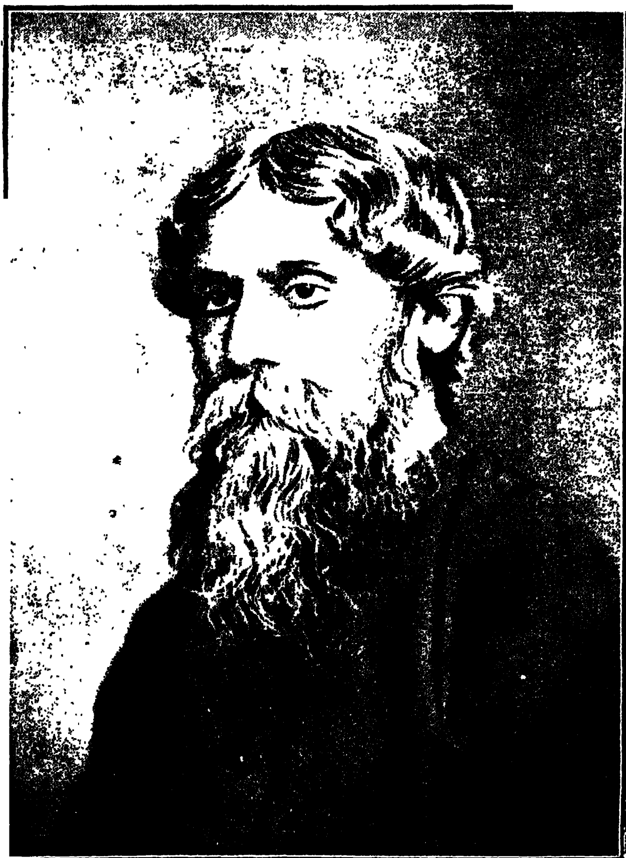
সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া :

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

এই রকম করে জগতের প্রত্যেককে তিনি এক সুরে বাঁধতে চেয়েছেন। এই জন্যেই তিনি জগতের কবি—এই জন্যেই তিনি বড়।

স্বর্ণ মুকুট

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশবৎসর পূর্ণ হলে পর বোলপুরে তাঁর স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকেরা মিলে তাঁর জন্মোৎসব করেন আর তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দেন। তারপর কলিকাতার টাউনহলে সমস্ত বাঙালী একত্র হয়ে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। কবিকে সম্মান দেখানো আর সম্বর্দ্ধনা করা এই সভার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনের পঞ্চাশটি বছর পূর্ণ করেছেন আর এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে কাব্য, কবিতা, গান, বক্তৃতার ভেতর দিয়ে এত রকম ভাব, এত রকম নূতনত্ব এত রকম শক্তি আমাদের সাহিত্যে তিনি দিয়েছেন যে তার প্রভাবে বাঙালীর মুখ জগতের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করবার যে রকম আয়োজন হয়েছিল, সে রকম আয়োজন এর আগে কেউ দেখেন নি। সম্বর্দ্ধনার দিন প্রকাণ্ড টাউন হলের কোনখানে একটি তিল রাখবারও ঠাঁই ছিল না— সমস্তই লোকে ভরে গেছ্‌লো। একটু দেরীতে এসে বিস্তর লোককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা ফিরে



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৮০ পৃঃ

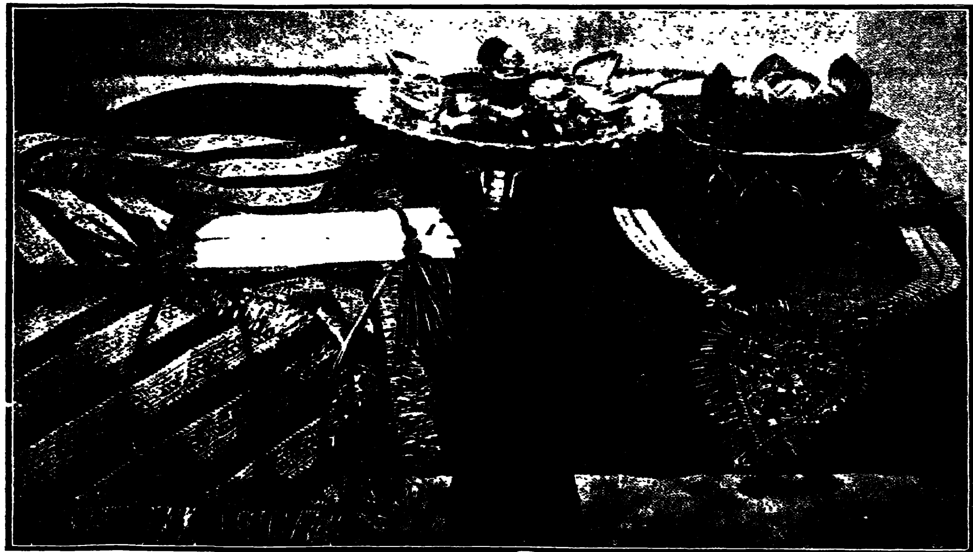
যেতে হয়েছিল। সে সভায় বাংলা দেশের যত বড় বড় লোক একত্র হয়েছিলেন। দেশের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে, মানে, অর্থে, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ সে রকম অনেক লোক সেদিন উপস্থিত ছিলেন। জজ্, ব্যারিষ্টার, রাজা, মহারাজা, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অর্থাৎ দেশের যাঁরা সেরালোক, এই সম্বর্দ্ধনায় সবাই তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন। বালক, বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোকেরাও বাদ ছিলেন না। লোকের এ রকম আগ্রহ আর দেখা যায় নি। সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গেছ্‌লো ছেলেদের ভেতর আর যুবকদের ভেতর। কবিকে সম্বর্দ্ধনা করবার সুযোগ পেয়ে বাঙালীর আনন্দ যেন আর ধরছিল না।

"বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
  হে কবি! তোমায় বরি হে আজি,—
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
  বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অযুত আঁখির উজল আলোকে
  হে কবি! তোমায় আরতি করি,
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
  শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।"

এই কথাগুলিই ছিল সেদিনকার সকলের প্রাণের কথা। কবিকে প্রথমে রৌপ্য পাত্রে করে অর্ঘ্য দেওয়া হোল। তারপর একটি স্বর্ণ সূত্রের হার আর একটি ফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হোল। সোনার থালাতে করে উপহার দেওয়া হোল একটি বহুমূল্যবান সোনার পদ্ম ও হাতীর দাঁতের ফলকে খোদাই-করে-লেখা সুন্দর এক অভিনন্দন,—আর এই সকলের সঙ্গে দেওয়া হোল সমস্ত বাঙালীর শ্রদ্ধা, প্রীতি আর সম্মান। কবিকে অভিনন্দন করে বাঙালী সেদিন গর্ব্বে উঁচু হয়ে উঠে বলেছিল—

"জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী, তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সত্য সত্যই অসাধারণ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি বক্তা, তিনি একজন ভাল অভিনেতা, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তিনি দেশহিতৈষী—একাধারে তিনি সব। এত রকম ভাবের সমাবেশ, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীতে অপর



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা-সামগ্রী—৮২ পৃঃ

কোন মানুষের জীবনে বোধ হয় আর দেখা যায় নি। তাঁর প্রতিভা শুধু বাংলার মধ্যেই যে আট্‌কে রইলো তা নয়, বাংলা দেশ ছাড়িয়ে—দিগ্‌বিদিকে তা ছড়িয়ে পড়লো—শেষে, সাগরের ও-পারে ইংলণ্ডে আর ইউরোপের অন্য সব দেশেও সাড়া পড়ে গেল।

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন। এই সময় তিনি তাঁর কতকগুলি কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে ইংরাজি গীতাঞ্জলি বার করলেন। এই গীতাঞ্জলির গানগুলি সে দেশের লোককে একেবারেই মাতিয়ে তুল্‌লে।

"তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।"

এ ভাবের গান সে দেশের লোকে আগে তো কখনো শোনে নি!

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

... ...

তোমারে জানিলে কেহ নাহি পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥"

পরকে এ রকম করে আপনার করে নিতে আর তো কেউ তাদের বলে নি!

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।"

এই বিশ্বব্যাপী মহামিলনের গান শুনে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

"আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

গীতাঞ্জলির এই স্তব শুনে তাদের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। ভারতের কবির কাছে ইউরোপের কবিরা নতি স্বীকার করলে। ভারতের কবি রবীন্দ্র-নাথ জগতের কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেলেন।

তারপর তাঁর গৌরব আরো চরমে উঠ্‌লো। বিদেশী-দের কাছ থেকে উচ্চ সম্মান লাভ করে দেশে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পুরস্কার 'নোবেল-পুরস্কার' লাভ করলেন। এই 'নোবেল' পুরস্কারটি কি, তা একটু বিশেষ করে বলা দরকার।

'নোবেল' সুইডেনের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক ডাক্তার। এঁর পূরো নাম আলফ্রেড নোবেল। ইনি খুব সহজ উপায়ে ডিনামাইট তৈরী করবার কৌশল বার করেন, আর এই থেকে কোটি-

কোটি টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর উপার্জ্জনের টাকা নিজের আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে জগতের হিতের জন্যেই সমস্ত দান করে যান। এ সম্বন্ধে এক সুন্দর যুক্তি তিনি তাঁর উইলে লিখে গেছেন। তিনি বলেছেন, নিজে উপার্জ্জন না করে কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে খুব বেশী টাকা পায়, তবে সে অলস হয়ে ওঠে আর তার মস্তিষ্কের ভাল রকম বিকাশ হয় না। কাজে কাজেই ধনীলোকদের উচিত, ছেলে মেয়েদের খুব বেশী টাকাকড়ি না দেওয়া। কারণ, বিনা চেষ্টায় অনেক টাকা পেয়ে তারা অলস হয়ে পড়বে—জগতের তা হলে কোন উপকারেই আসবে না।

আলফ্রেড নোবেল উইল করে যান যে, তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে প্রত্যেক বৎসর পাঁচটি বিষয়ের জন্যে পাঁচটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। সে পাঁচটি বিষয় এই—সাহিত্য, রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আর জগতে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা। এই পাঁচটি বিষয়ে সব চেয়ে উন্নতি করেছেন বা আদর্শের সৃষ্টি করেছেন, এ রকম পাঁচজন লোক প্রত্যেকে এক লক্ষ বিশ হাজার করে টাকা প্রতি বছর পুরস্কার পেয়ে থাকেন।

১৮৯৬ সালে ৬৩ বছর বয়সে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়। নোবেল-পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় ১৯০১ সাল থেকে। এতদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের লোকেরাই এই পুরস্কার পেয়ে আস্‌ছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে—শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত এসিয়ার মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথই ১৯১৩ সালে সব প্রথম এই পুরস্কার পান। তারপর থেকে আজ অবধি এ দেশের কেউ এখনো এই পুরস্কার পান নি। নোবেল-পুরস্কারের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নিজে না নিয়ে, সমস্তই তিনি তাঁর বোলপুর স্কুলে দান করেন।

নোবেল-পুরস্কারে রবীন্দ্রনাথ একাই যে সম্মানিত হয়েছেন তা নয়, তাঁর এই সম্মানে সমস্ত বাঙালীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে জগতের সাহিত্য-সভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন, একি বাঙালীর কম গৌরব! কিছুদিন আগে সম্বর্দ্ধনা-সভায় যে বলা হয়েছিল—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

এই কথাগুলি অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল।

তারপর, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট্ (ডক্টর অব্ লিটারেচার) অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দেন। এ উপাধিতে তাঁর সম্মান বেশী আর কি বাড়বে! তাঁকে উপাধি দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজেরই বরং ধন্য হওয়ার কথা। গবর্মেণ্ট থেকে তিনি 'নাইট' উপাধি পান। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঐ উপাধি গবর্মেণ্টকে ফিরিয়ে দেন। পাঞ্জাবে তাঁর দেশের লোকের উপর অত্যাচারের কথা শুনে তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, তাঁর অসহায় দেশী ভাইদের পাশেই তিনি দাঁড়াতে চান, উপাধি ধারণ করে তাদের কাছ থেকে তিনি আলাদা হয়ে সরে থাকতে চান না। তিনি সকল উপাধির উপরে। তাঁর কোন উপাধি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি?

বিশ্ববিজয়

শুধু নোবেল-পুরস্কার লাভই যে রবীন্দ্রনাথের সেরা গৌরব, তা নয়। ১৯২০ সালে আবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। বিদেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে শুধু তিনি ঘৃণাই করেন না, সে সকলে আমাদের কোনই দরকার নেই এমন কথা তিনি বলেন না। কিন্তু তা বলে আমরা বিদেশের খালি নকলই করবো, এ অবশ্য তিনি চান না। পৃথিবীর অপর সব জাতির তুলনায় আমাদের সভ্যতা অনেক পুরাতন,—আমরাই বা খাটো কিসে? ভিখারীর মতো আমরা বিদেশীদের কাছ শুধু চাইবার জন্যেই যাবো কেন? আমরাও তাদের কাছ থেকে নেব, তারাও আমাদের কাছ থেকে নেবে। এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এ-যাত্রায় বিদেশের কাছে জয়মাল্য পেয়েছিলেন।

কিন্তু এবার তাঁর ইউরোপে গিয়ে পৌঁছবার ঢের আগেই তাঁর গীতাঞ্জলির বাণী সেখানকার নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর গীতাঞ্জলি সে সব দেশে যে কি রকম আদর পেয়েছিল, তা বলে শেষ করা যায় না।

গুণী লোকেরা যে যে-রকমে পারেন গীতাঞ্জলির রস গ্রহণ করেও যেন তৃপ্ত হচ্ছিলেন না। এই নিয়ে কত রকমের আলোচনাই সেখানকার লোকেরা করতেন। ফরাসীদেশের এক কাগজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারী সুন্দর সুন্দর কথা একবার বেরিয়েছিল। লেখক একজন ফরাসী—ফরাসী ভাষাতেই তিনি লিখেছিলেন। 'প্রবাসী'পত্রিকায় এর অনুবাদ বেরিয়েছিল,—তার কতক কতক এখানে তুলে দিচ্ছি। ফরাসী ভদ্রলোকটি লিখ্‌ছেন—

> 'ঠাকুর-মহাশয় মা সরস্বতীর একজন বরপুত্র। তিনি এমন সুন্দররূপে নিজ ভাষাতে তাঁহার গানগুলি রচনা করিয়াছেন যে মা সরস্বতীর কৃপায় ও সহায়তায় তাঁহার অনুবাদকগণও সুচারুরূপে ভাষান্তর করিতে পারিয়াছেন।...
>
> আমি সময় সময় পারী সহরের বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষার বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই বিদ্যালয়ে একটি অল্পবয়স্কা ফরাসী মহিলার সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি সযত্নে বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেন। কেন শিখিতেন, জানেন? ঠাকুর-মহাশয়ের গীতাঞ্জলি নামক পুস্তক কবিবরের নিজ ভাষাতে পড়িবার নিমিত্ত, আর কি!

আমি শুনিয়াছি যে ঠাকুর-মহাশয় আপন দেশে ঋষিস্বরূপ পূজনীয়। সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তাঁহার কবিতা মুখস্থ করিয়া থাকেন।...ছেলেপিলে পর্য্যন্ত তাঁহার গীত গাহিয়া আনন্দলাভ করে। মেয়ে-মানুষ সকল ঘরকন্না করিতে করিতে তাঁহার গীত দ্বারা শ্রম দূর করিয়া থাকেন। পুরুষেরা গঙ্গার প্রসারিত বক্ষে নৌকা চালাইয়া তাঁহারই গান জপ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে করিবেন না যে তিনি একজন একলসেঁড়ে মুনি। তিনি লোক-সমাজের মধ্যে সর্ব্বদা চলা-ফিরা করেন। তিনি পশ্চিম দেশের সাহিত্য ও তত্ত্ব একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন।...তিনি অনেকবার আমাদের দেশে পর্য্যটন করিয়াছেন।...

এই গীতাঞ্জলির ইতিহাস কোন্ যুগে বা কোন্ স্থানে স্থিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাহার ঘটনা-বৃত্তান্ত সর্ব্ব দেশের ও সকল সময়ের। ইহা কেবল মানব-হৃদয়ের ইতিহাস নয়, ইহার মধ্যে প্রকৃতির লীলা-খেলা উপস্থিত। ইহাতে দেখা যায় কেমন করিয়া মানব-জীবন আপন মিষ্ট রসে মুগ্ধ হইয়া যায়।...এই কবিতাতে অনেক অসাধারণ গুণ আছে। ইহাতে সরলতা, মধুরতা, মৃদুতা, আমোদ, কৌতুক, অনেক ভাব ও অনেক চিন্তা, ভাবনা, প্রেম, শোভা, সৌন্দর্য্য পাইবেন। কিন্তু যেন এ কথা মনে থাকে যে

> এ সকল কবিতা অনেক দূর থেকে আসিয়াছে। যে সভ্যতা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের ফরাসী সভ্যতা নয়। এমন গান কি আমরা কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিব? ইহার ভিতর অতি প্রাচীন, অতি গুপ্ত কথা রহিয়াছে। ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যের নিদর্শন। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমরা এখন পর্য্যন্ত এই সাহিত্য জানি না।'

রবীন্দ্রনাথ এবার ইউরোপের মাটিতে পা দিতে না দিতেই নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। প্রথমে তিনি গেলেন ইংলণ্ডে। সেখান থেকে গেলেন আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে না আসতেই জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, হল্যাণ্ড্, বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড্ এই সব দেশ থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এলো। এই সব জায়গায় তিনি যে রকম সম্মান আর সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন তা দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এ রকম সম্বর্দ্ধনা কোন দেশের কোন কবি তো পান নি, কোন সম্রাট্‌ও কখন পেয়েছেন কি না সন্দেহ। কয়েক জায়গার সম্বর্দ্ধনার কথা তোমাদের শোনাই।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন সহরে যখন তিনি

এসে পৌঁছ্লেন, তাঁকে দেখবার জন্যে রেল ষ্টেশনে অসংখ্য লোক জমা হয়ে গেল। সেখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সন্ধ্যে বেলায় বক্তৃতা শেষ করে তিনি বেরিয়েছেন, এমন সময় সেখানকার অসংখ্য ছাত্র বড় বড় বাতির আলো হাতে নিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো,—ছাত্রদের সঙ্গে সহরের লোকেরাও যোগ দিলে। তারপর কবিকে মাঝখানে রেখে অসংখ্য বাতির আলোর শোভাযাত্রা করে ও সমস্ত পথ ডেন্‌মার্কের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে তাঁকে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর তাঁর বাড়ীর সামনে সে কি ভিড়! লোকের সে কি উল্লাস! রাত্রি দশটা হয়ে গেল, তবু তাদের উল্লাস আর জয়ধ্বনি থামে না। কবি তখন বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, তাদের সেই আনন্দে যোগ দিলেন, আর মহা উল্লাসে বলে উঠ্লেন,—'জয়, ডেনমার্কের জয়! জয়, ডেন্-মার্কের জয়!'

নোবেল-পুরস্কার সুইডেন্ থেকেই তিনি পেয়ে-ছিলেন। পুরস্কার নির্ব্বাচন করবার জন্যে এখানে বড় বড় পণ্ডিতদের এক সভা আছে। এই পণ্ডিত-

সমাজ রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের সভায় নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। এখানে বিখ্যাত-বিখ্যাত পণ্ডিতেরা রবীন্দ্র-নাথকে অভিনন্দন করেন। এই সভায় কোন-কোন পণ্ডিত বলেন যে, নোবেল-পুরস্কার আজ পর্য্যন্ত অনেকেই পেয়েছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শিল্প ও সাধনা এ দুয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ যে রকম ভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি।

সুইডেনে এক অতি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে সেখানকার ধর্ম্মমন্দির থেকে এক শোভা-যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভযাত্রার নেতা হয়েছিলেন ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহাশয় নিজে।

জার্ম্মানির বার্লিন সহরে তাঁর বক্তৃতার বিরাট আয়োজন হয় আর এই সময় ভারী মজার ব্যাপার ঘটে। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিমন্ত্রণ করে-করেছিলেন—বক্তৃতা দেবার জন্যে। বেলা বারোটার সময় বক্তৃতা হবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু দু'তিন ঘণ্টা আগে থেকেই লোক জমতে সুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সমস্ত হল ভরে গেল, কোনখানে তিল রাখবারও জায়গা রইলো না, এমন কি বারান্দা আর সিঁড়িতে

পর্য্যন্ত লোকে ভরে গেল। বারোটার সময় কবি যখন এলেন, রাস্তায় তখন হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিড় সরিয়ে দরজা অবধি নিয়ে এলেন, কিন্তু বক্তৃতার হলে আর ঢুকতে পারেন না। বক্তৃতার জায়গা উপরে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক গিস্ গিস্ করছে। এগোয় কার সাধ্যি! পথ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হোল। কিন্তু যারা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিল তারা পিছু হট্‌তেই পারে না—পিছনেও যে ভিড়! কর্ত্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে পুলিসের ভয় দেখালেন। লোকেরা এতে ভয়ানক চটে গেল। তারা এসেছে ভারতের কবিকে দেখতে আর তাঁর বক্তৃতা শুনতে—এতে তাদের অপরাধ! কিন্তু যিনি বক্তৃতা দেবেন, তিনি যে এদিকে বক্তৃতার জায়গাতেই ঢুকতে পারছেন না, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। কর্ত্তৃপক্ষ ভয়ানক মুস্কিলে পড়লেন। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপক সকলকে বললেন, কবিবরকে যদি ফিরে যেতে হয়, তা হলে বার্লিনের লোকের লজ্জার আর সীমা থাকবে না। জায়গা কোন রকম করে খালি করতেই হবে। যাঁরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে

আছেন বক্তৃতা শোনবার জন্যে, তাঁদের অবশ্য তিনি কিছুই বলছেন না, তবে তিনি নিজে আর তাঁর ছাত্রেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, এতে জায়গা অনেকটা খালি হয়ে যাবে। এই বলে তিনি বাইরে গেলেন, আর তাঁর পিছু পিছু প্রায় পাঁচ-ছ' শ ছাত্র বেরিয়ে চল্‌লো। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছাত্রদের বললেন যে, তাদের নিরাশ হতে হবে না। কাল তিনি আলাদা করে তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করবেন।

তারপর বক্তৃতা শেষ করে কবিবর যখন বাইরে বেরুলেন, দেখা গেল প্রায় চোদ্দ-পোনের হাজার লোক রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাঁকে দেখবার জন্যে। তিনি চলে যেতে লাগলেন, আর লোকেরা তাঁকে দেখে বিপুল জয়ধ্বনি আর উল্লাসে রাস্তা একেবারে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

জার্ম্মানির লোকেরা তাঁকে দেখবার জন্যেও যেমন পাগল, তাঁর বই পড়বার জন্যেও তেমনি পাগল। রবীন্দ্রনাথের "সাধনা" বইখানির জার্ম্মান অনুবাদ ছাপা হয়। এই বই জার্ম্মানির লোকের এত ভাল লাগে যে, তিন সপ্তাহের ভেতর এর পঞ্চাশ হাজার খানা বিক্রী হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই গেছ্‌লেন, সমাদরের আর অন্ত ছিল না। এবার ফ্রান্সের কথা বলি—এখানেই তিনি সব প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়। সেখানকার অধ্যাপক সিল্‌ভঁ্যা লেভি মহাশয় বিরাট আয়োজন করেন। বক্তৃতার দিন কবিবরকে দেখবার জন্যে, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে সমস্ত সহর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। ভারতবর্ষের অনেক ছাত্র সেখানে থাকেন। তাঁরা সবাই সেদিন কবি-বরের সঙ্গে ছিলেন। কবিবর নিজে কোন দিন বিদেশী পোষাক পরেন না, তা তোমরা জান। ছাত্রেরাও সেদিন মাথায় পাগড়ী পরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছিলেন। কবিবর ধীরগম্ভীরপদে বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর তাঁকে ঘিরে চল্‌ছিলেন পাগড়ী-পরা তাঁর স্বদেশের যুবকেরা। তখনকার সে দৃশ্যটি ভারী চমৎকার। তাঁর সেই শান্ত মহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখে দর্শকেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে লাগলেন।

কবিবরের পরিচয় দিতে উঠলেন স্বয়ং অধ্যাপক সিল্‌ভঁ্যা লেভি মহাশয়। তিনি যা বললেন, তা অতি সুন্দর। তিনি বললেন,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কে, তাহা আপনাদের বলিয়া আমি মূঢ়তার পরিচয় দিব না; তাঁর নাম ও তাঁর গ্রন্থাবলী বিশ্বব্যাপী গৌরবের অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে।... ঠাকুর মহাশয়ের যে প্রতিভা, তাহা স্বয়ং ভারতেরই প্রতিভা—যে প্রতিভা বুদ্ধদেব, ব্যাস, বাল্মীকি, অশ্বঘোষ, কালিদাস প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহা কালে কালে নব নব উজ্জ্বল নামে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাই আজ এই কবির মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়াছে।...

আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ষ্ট্রাস্‌বুর্গ ইউনিভারসিটি কেবল যে একজন প্রতিভা-বান কবিকে ও এক মহাজাতির যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভাকে সম্মান করিল তাহা নয়, ষ্ট্রাস্‌বুর্গের ফরাসী ইউনিভার-সিটি ভারতের ভগিনী 'বিশ্বভারতী'কে সম্মান করিল।]

...কবির নামের অর্থ রবির রাজার রাজা এবং তাঁর বংশগত উপাধির অর্থ দেবতা। যারা তাঁর রচনা পড়ে, যারা তাঁকে দেখে, যারা তাঁর বাণী শোনে তারাই অনুভব করে, এমন দম্ভভরা নাম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কখনো এর চেয়ে সুসঙ্গত হইতে পারে না।

যিনি রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর তিনি ভারতের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও ভারতের জনপুঞ্জকে রক্ষা করুন।

তারপর সেই মুগ্ধ জনপুঞ্জকে কবিবর তাঁর 'তপোবনের বাণী' শোনালেন। শ্রোতারা নীরব হয়ে, বিনয়-নম্র হয়ে তাঁর সে বাণী শুনলেন। তাঁর বাক্যের ছন্দ আর তাল তাঁর অসাধারণ কণ্ঠস্বর সকলকে অভিভূত করে ফেললে। কেউ কেউ এত বেশী মুগ্ধ হোল যে প্রবন্ধ পড়া শেষ করে যখন তিনি চলে যেতে লাগলেন তখন তারা তাঁর লম্বা জোব্বার কিনারার ধূলো ভক্তির সহিত চুম্বন করে করে মুছে নিতে লাগলো। আমাদের দেশের জ্ঞান আর বিদ্যার কাছে সে দেশের নতি স্বীকারের একেবারে চরম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ যে-দেশেই পা দিয়েছিলেন, ভক্তির চরম অর্ঘ্য লাভ করেছিলেন। আমেরিকার লোকে তো তাঁকে যীশুখৃষ্টের অবতার বলেই পূজো করেছিল।

কিন্তু এই ভক্তি, এই অর্ঘ্য কিসের জন্যে! কি তিনি তাদের দিয়েছিলেন! কি তাদের বলেছিলেন! তিনি তাদের কি দিয়েছিলেন, শুনবে? তিনি তাদের দিয়েছিলেন, শান্তির বাণী। সে বাণী পরকে আপনার করে, আর জাতির মধ্যে জাতির, মানুষের মধ্যে মানুষের ভালবাসা জন্মায়, দূরকে নিকটে নিয়ে আসে।

তিনি তাদের কি বলেছিলেন শুনবে? তিনি বলেছিলেন,—

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।

মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

তাঁর এই ডাকে দিক্‌দিগন্তে সাড়া পড়ে গেছ্‌লো, তাই—

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

বিশ্বমানবের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনা করে আর তাঁর পুণ্যতীর্থ "বিশ্বভারতী"র জন্যে জগতের গুণিলোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি আর ভক্তি উপহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। তাঁর এই বিশ্বভারতীর কথা আর শান্তিনিকেতনের কথা এবার তোমাদের শোনাব। কিন্তু তার আগে কবিবরের এসিয়া ভ্রমণের কথা সংক্ষেপে তোমাদের শুনিয়ে দিই।

পূর্ব্ব এসিয়ায়

পশ্চিমদেশ রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যে শান্তির বাণীই শুনেছিল তা নয়, মুক্তির বাণীও শুনেছিল। পশ্চিমের লোকেরা ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য্য নিয়েই উন্মত্ত, তারা শুধু জড়-বিজ্ঞানেরই খবর রাখে, মুক্তির সন্ধান তারা পাবে কোথয়? রবীন্দ্রনাথের কাছে এর অল্প একটু শুনেই তারা ধন্য হয়ে গেছ্‌লো।

ইতিহাসে তোমরা পড়েছ যে অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতা এ রকম উন্নত ছিল যে, চীন দেশে, জাপানে আর প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে সেই সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। ঐ সকল দেশের সঙ্গে তখন আমাদের হৃদয়ের আর মনের বেশ একটি সম্বন্ধ ছিল। এতে তাদেরই যে শুধু উপকার হোত তা নয়, আমাদেরও উপকার হোত। তারপর অনেক বছর থেকে ঐ সব দেশের সঙ্গে আমাদের সকল রকম সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর চীনের পিকিন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই

উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ চীন-ভ্রমণে যান। যাবার পথে তিনি রেঙ্গুন, মলয়দ্বীপ, যবদ্বীপ এই সব জায়গা হয়ে যান। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি রাজার সম্মান পেয়েছিলেন। চীন দেশেও যে তাঁর সম্বর্দ্ধনার চূড়ান্ত হয়েছিল, তা আর বলতে হবে না বোধ হয়। রবীন্দ্র-নাথ নিজেই বল্‌ছেন,—"···তাহারা তাহাদের অতিথি-বাৎসল্যের আতিশয্যে আমাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। আমার সঙ্গীরা তথায় বর-যাত্রীর আদর লাভ করিয়া-ছেন। আমাদের সন্তোষবিধানের জন্য, অভাব অভি-যোগ দূর করিবার নিমিত্ত সৈন্যদল আমাদের সঙ্গে গিয়াছে, প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশনে খবর লইয়াছে, যে, ভারতবাসী অতিথিদের কোন প্রকার অসুবিধা আছে কিনা—"

রবীন্দ্রনাথ যখন পিকিন সহরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানকার শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র ইতর, সকল রকমের লোকই তাঁর অভ্যর্থনায় যোগ দিয়েছিল। চীন দেশ আমাদের কাছ থেকে সকল রকমেই এখন পৃথক্। ইংলণ্ড, আমেরিকা আজকাল আমাদের এ-পাড়া ও-পাড়ার মতো। চীনদেশ অনেক কাছে হলেও তাদের ভাষা ভিন্ন, চাল-চলন ভিন্ন, সকল বিষয়েই

তারা আলাদা। সেখানকার লোকেরা আমাদের দেশের ভেতরকার কোন খবরই রাখে না। তবু যে তারা আমাদের কবিকে এ ভাবে অভ্যর্থনা করলো, তা খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় কি?

রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে চীনের ছাত্রদের উৎসাহের আর সীমা ছিল না। পিকিনের ছাত্ররা সেখানকার গবর্মেণ্টের কাছে আবেদন করেছিল যে রবীন্দ্রনাথ এলে পর তাঁকে যেন চীন-সম্রাটের প্রাসাদের কাছে থাকতে দেওয়া হয়। ছাত্রদের এই আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। পিকিনের প্রায় পাঁচ হাজার চীনা-ছাত্র একত্র হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে। রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যর্থনা-সভায় এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতা আর চীন ও ভারত-বর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

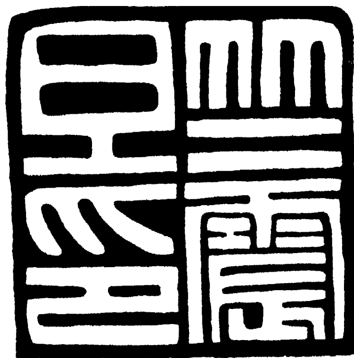
চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ হুয়ান্ তাং রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। সম্রাট্ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি ছবি উপহার দেন। ছবিখানি প্রায় চারশ বছরের পুরাতন।

রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে গেছ্লেন, মৈত্রীর ভাব স্থাপন করতে। তিনি বলেছেন—

"ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা প্রচারকল্পে আমি তথায় যাই নাই—গিয়েছিলাম, শুধু সহজ মানুষের মতন—মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান সেই সম্বন্ধের দোহাই দিয়েই গিয়েছিলাম। ......মানুষের অন্তরতম গভীরতা বুঝতে গেলে, নত হয়ে, নম্র হয়ে, সাধক হয়ে যেতে হবে, উঁচু মাথায় যাওয়া চলে না।......আমি তাই নত হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষের কাছে মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম,......ভাই, আমি সামান্য কবি মাত্র, আমি তোমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই, মাথার উপরে উঠতে চাই না।......আমি জানি, উচ্চ নীচে কখন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তাই, তাদের মধ্যে সমান হয়ে মিলতে গিয়েছিলাম।"

চীনদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পড়েছিল। চীনারা তাঁকে নববস্ত্র আর অনেক রকম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। নীল পায়জামা, কমলা লেবুর রঙের আলখাল্লা আর বেগুনে রঙের টুপি এই সব তাঁকে পরতে দেওয়া হয়। তিনি এইগুলি পরে সকলকে দেখান, আর প্রার্থনা করেন যেন সূর্য্যের মতো প্রতি-দিন নূতন জীবন লাভ করে নূতন নূতন ভাবে সকলকে

তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। চীনারা তাঁর নামকরণ করেন, "চু—চেন্—তাং" এর অর্থ—বজ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারত-সূর্য্য। এই নামটি চীনা অক্ষরে এই



চু—চেন্—তাং

রকম। চীন দেশ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জাপান, যবদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া—এই সব জায়গাতেও গেছ্লেন। জাপানের লোকেরা তাঁর বক্তৃতা শুনে বলেছিল—আমরা ভারতবর্ষেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সত্য লাভ করবো। অন্য দেশের কাছে যা পাব, তাতে বারে বারে মুগ্ধ হব, আর বারে বারে ভুল করবো।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ভক্তির অর্ঘ্য এনেছিলেন, চীন-জাপান ভ্রমণ করেও সেই অর্ঘ্য

নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। পশ্চিমের মতো পূর্ব্বের জন্যেও তাঁর সাধনার দ্বার খোলা ছিল—

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগরতীরে।

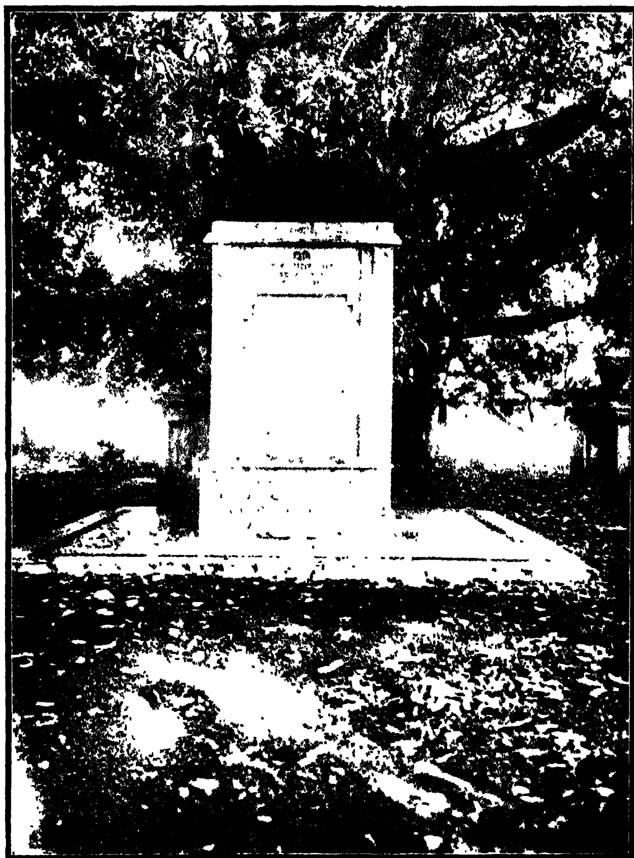
তাঁর এই পুণ্যতীর্থ শান্তিনিকেতনের কথা এবার তোমাদের বলব। শান্তিনিকেতনের কথা বলতে গেলে আবার গোড়ায় ফিরে যেতে হয়। শান্তি-নিকেতনে এখন বিশ্বের মেলা বসে গেছে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সকল জাতের লোক মিলে এটিকে এখন তীর্থস্থান করে তুলেছে। কিন্তু গোড়াতে এটি ছিল একটি জনশূন্য মাঠ। কি করে এই জনশূন্য মাঠে বিশ্বের মেলা বসে গেল, তা বড়ই অপূর্ব্ব।

এই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রবীন্দ্র-নাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষি একদিন বোলপুর ষ্টেশনে থেকে এই মাঠ দিয়ে রায়পুরে যাচ্ছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এই মাঠের উপর

তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি ছাতিম গাছ ছাড়া আর কোন গাছই ছিল না। তিনি অল্পক্ষণের জন্য ছাতিমের ছায়ায় দাঁড়ালেন। বিস্তীর্ণ মাঠ। চারদিক ধূ-ধূ করছে। বাড়ীঘর নেই, গাছপালা নেই—গাছপালা দূরের কথা, সবুজ রঙের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। খালি ঐ দুটি ছাতিম গাছ মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। উপরে নীল আকাশ, নীচে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। যত দূর দৃষ্টি যায়, এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এই নির্জ্জন স্থানটি মহর্ষির বড়ই ভাল লাগলো—এই ছাতিমের ছায়াটি সাধনার উপযুক্ত জায়গা বলে তাঁর মনে হোল। এর পর থেকে মাঝে মাঝে এই জায়গায় তাঁর তাঁবু পড়তে সুরু হোল। এই জায়গার নাম ছিল ভুবনডাঙ্গা। কাছেই ছিল একদল ডাকাতের আড্ডা। তারা এখানে ডাকাতি করতো। বোলপুর থেকে চারদিকের গ্রামে যাবার এই হোল পথ। পথের মাঝে এই মাঠ। মাঠে লোকজন নেই, কাজেই ডাকাতির পক্ষে এমন সুবিধামত জায়গা আর হয় না। কত লোককে যে ডাকাতেরা খুন করে ঐ ছাতিমগাছের তলায় পুঁতে রেখেছিল তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু ঐ ছাতিম-তলাই হয়ে দাঁড়ালো মহর্ষির নির্জ্জন

সাধনার স্থান। তারপর ডাকাতের দলের সর্দ্দার ধরা দিল। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সে মহর্ষির সেবায় লেগে গেল। যেটা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, সেইটা হয়ে দাঁড়ালো পরম আশ্রয়ের জায়গা—আশ্রম।

মহর্ষি এই জায়গার নাম দিলেন শান্তিনিকেতন। তারপর তিনি এখানে আশ্রম রচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অন্য জায়গা থেকে মাটি আনিয়ে সেই মাটি শান্তিনিকেতনে ফেলে তিনি এক সুন্দর বাগান তৈরী করলেন। গোলাপ, যুঁই, বকুল, বেল, মাধবী, মালতী, গন্ধরাজ এই সব ফুলের গাছ—আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা এই সব ফলের গাছ এই বাগানে দেওয়া হোল। যেটা ছিল মরুভূমি, সেখানে শাল, মহুয়া, দেবদারু এই সব বড় বড় গাছও দেখতে দেখতে বেড়ে উঠতে লাগলো। ফুল ফুট্‌লো, সৌরভ ছুট্‌লো, ছায়া নাম্‌লো। পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে উৎসব জমিয়ে তুল্‌লো। শান্তিনিকেতন সকলের পক্ষেই শান্তির নিকেতন হয়ে উঠ্‌লো। ফলে, ফুলে, গাছে-ভরা এখনকার শান্তিনিকেতন দেখলে তখনকার জনশূন্য মাঠের কল্পনা করা শক্ত হয়ে ওঠে। সেই ছাতিমগাছ দুটি এখনো আছে। ছাতিম তলায়



শান্তিনিকেতন—ছাতিমতলা—১১১ পৃঃ

মার্ব্বেলের বেদীটি মহর্ষির নির্জ্জন সাধনার জায়গাটির এখনো সাক্ষী দিচ্ছে। এই বেদীতে লেখা আছে—

তিনি

আমার প্রাণের আরাম

মনের আনন্দ

আত্মার শান্তি।

মহর্ষি এই জায়গায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঈশ্বরের উপাসনা করে কাটিয়েছেন। তিনি এখানে যে সাধনার বীজ বপন করেছিলেন, তার ফলে শান্তিনিকেতনের প্রান্তর আজ পুণ্যতীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক টাকা খরচ করে তিনি এখানে একটি মন্দির তৈরী করান। মন্দিরটির মেজে মার্ব্বেলের তৈরী। নানা রকম রঙিন কাচের দেওয়াল। দেয়ালে অনেক-গুলি দরজা। দরজাগুলি মেলে দিলেই চারদিক একেবারে খোলা। ধর্ম্ম-উপাসনার জন্যেই এত আয়োজন করে এসব তৈরী হয়। আশ্রমে যাঁর ইচ্ছে এসে সাধনা করবেন, থাকবেন, তারই ব্যবস্থা হয়। সাধনা আর উপাসনা ছাড়া আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার আর বিদ্যালয়

স্থাপন করা হবে এ ইচ্ছাও তাঁর ছিল। মহর্ষির এই ইচ্ছা পূর্ণ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি স্কুল খুললেন। তখন চার পাঁচটির বেশী ছাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পড়াতেন, আর নিজেই সব দেখা শুনা করতেন। দেখতে দেখতে ছাত্র-সংখ্যা বেড়ে চললো। তার পর দশ পনেরো বছরের ভেতর দেশ বিদেশ থেকে শত শত ছাত্র এসে স্কুলে ভর্ত্তি হোল। শান্তিনিকেতনের মাঠ বিদ্যালয়ের কুটীরে কুটীরে ছেয়ে গেল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মহর্ষি একদিন বলেছিলেন—আমি মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি সমস্ত মাঠ ছেলেতে ছেলেতে ভরে গেছে। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কেউ কোন রকম নিরাশার ভাব দেখালে তিনি বল্‌তেন—তোমরা কিছু ভেবো না, এখানকার জন্যে কোন ভয় নেই—আমি ওখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতংকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

এই শান্তিনিকেতন-স্কুলটি ভারী মজার। স্কুল বললে আগেই তোমাদের মনে পড়ে যায় মাষ্টার-পণ্ডিতের বকুনি, আর মার-ধোর। স্কুলে যাবার নাম হলেই মনটি তোমাদের দমে যায়। এখানকার স্কুল কিন্তু

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—বকুনি বা মারধোরের নাম-গন্ধও এখানে নেই। লেখাপড়ার নামে ছেলেদের মন খেলাধূলোর মতোই আহ্লাদে নেচে উঠে। কেন? এখানে তারা খোলা মাঠে হুটোপাটি করে বেড়ায়। গাছের ছায়ায় বসে লেখা পড়া করে। শিক্ষকমশায়দের সঙ্গে স্বছন্দে মিশতে পায়। বড় আনন্দেই এখানে তাদের দিন কাটে। তারা বলে,—

"আমাদের শান্তি নিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন॥
তার আকাশ ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীলগগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন॥
— ... ...
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়াছে একতানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন॥"

৮

এখানে তাদের থাকবার, লেখাপড়া করবার ধরণ-ধারণ, ব্যবস্থা একেবারে আলাদা রকমের—আর তা ভারী চমৎকার। সে সব কথাই এবার তোমাদের এক এক করে শোনাই।

ভোর চারটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটবড় সকল ছেলেকেই ঘুম থেকে তোলা হয়। ছেলেরা মুখ হাত পরিষ্কার করে শোবার ঘর নিজে নিজেই সাফ করতে লেগে যায়। তারপর খোলা জায়গায় সবাই কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে। ব্যায়ামের পর স্নান। আশ্রমের ভেতরেই ইঁদেরা। ইঁদেরা থেকে ছেলেরা নিজে নিজেই জল তুলে স্নান করে নেয়। স্নানের পর ধ্যান ধারণা আর উপাসনা। প্রথমে ধ্যান। সকল ছেলেকেই স্থির হয়ে বসে ঈশ্বরের কথা একটু-আধটু চিন্তা করতে হয়। এ সময় কথা কওয়া বা ছুটোছুটি করা একেবারেই বারণ। ধ্যানের সময় পনের মিনিট। ধ্যানের পর উপাসনা। সকল ছেলে এক জায়গায় জড় হয়ে সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আব এক স্বুরে প্রার্থনা করে,—

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নোবোধীঃ।
নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

[তুমি আমাদের পিতা। তুমিই যে আমাদের পিতা, এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগরিত কর। তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাদিগকে আঘাত করিও না। হে সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা, আমাদের যাবতীয় পাপ তুমি দূর কর। যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু কল্যাণ, তাই তুমি আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।]

উপাসনার পর ছেলেরা কিছু খাবার খেয়ে নেয়, তারপর সাতটার সময় পড়ার ক্লাশ বসে। ক্লাশের কোন নির্দ্দিষ্ট ঘর নেই। আশ্রমের ভেতর বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি বাদল না থাকলে এই সব গাছের তলাতেই ক্লাশ বসে। ঘণ্টা চারেক ক্লাশ হয়, তারপর ছুটি। বেলা বারটার সময় খাওয়া হয়। খাওয়াদাওয়ায় নিরামিষের ব্যবস্থা কড়াক্কড়। খাওয়ার পর ছেলেরা নিজের নিজের ঘরে বসে যে যার পড়া তৈরী করে। এ সময় শুয়ে থাকবার বা ঘুমোবার নিয়ম নেই।

বেলা দুটো থেকে আর একবার ক্লাশ বসে। তারপর পাঁচটার সময় ছুটি। বিকেলের জলখাবার খেয়ে

ছেলেরা খেলাধূলোয় মেতে যায়। খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেউ টেনিস্-ফুটবল খেলে, কেউ ব্যায়াম করে। কেউ বা এ সকলে যোগ না দিয়ে বাগান তৈরী করে, যেমন—ফুলগাছের গোড়া খুঁড়ে দেওয়া, ফুলগাছে জল দেওয়া—এই সব। কেউ কেউ বা দল বেঁধে বেড়াতে যায়—একেবারে অনেক দূর পর্য্যন্ত। কিন্তু যে যেখানে যাক্, সন্ধ্যার আগে সকলেরই ফেরা চাই। সন্ধ্যার সময় হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে—আবার সকলকে সকালের মতো উপাসনার জন্যে এক জায়গায় জড় হতে হয়। সন্ধ্যা উপাসনার মন্ত্র এই,—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

[যে দেবতা অগ্নিতে আছেন, জলে আছেন, যিনি সমস্ত বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি ওষধি-সমূহে বিরাজ করিতেছেন, সেই চরাচরব্যাপী ভূমাকে বার বার নমস্কার করি।]

সন্ধ্যা উপাসনার পরের সময়টি বড়ই আনন্দের। যারা ছোট, তারা রবীন্দ্রনাথের কাছে বা শিক্ষক মশায়দের কাছে বসে নানা রকমের গল্প শোনে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে দিন গল্প করতে বসেন, সে দিন ছেলেদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। এই গল্পের ক্লাশে বড় বড় ছেলেদের যোগ দেবার নিয়ম নেই, কিন্তু গল্প শোনার লোভ তারা ছাড়তে পারবে কেন? গল্প শুনতে কে না চায়? তারা বাইরে দাঁড়িয়ে ফাঁক-ফুকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

শুধু গল্প শোনা নয়, এই সময় ছেলেরা গানও শেখে—অবশ্য যাদের গলার সুর আছে। কোন কোন দিন ম্যাজিক্ লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা হয়, এতে তারা কত নূতন-নূতন জিনিষ শেখে। কোন কোন দিন বা ছেলেরা ছোটখাট নাটক অভিনয় করে।

রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়াই নিয়ম। তবে যারা বড় ছেলে তাদের কথা ভিন্ন। চাঁদনি রাত হলে তারা খোলা মাঠে বেড়িয়ে বেড়ায় আর গান গেয়ে আমোদ করে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেয়। ছেলেরা গান দিয়ে কাজ আরম্ভ করে, আর গান দিয়েই কাজ শেষ করে।

স্কুলে কোন হেড্‌মাষ্টার নেই। শিক্ষকেরা সবাই সমান। ছেলেরা অবাধে তাঁদের সঙ্গে মিশতে পায়। সকল বিষয়েই ছেলেদের স্বাধীনতা। ছেলেরা নিজেদের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নেয়। সেই হয় তাদের নেতা বা কাপ্তেন। নিজেদের কাজ নিজেরাই দেখে। কেউ কোন অন্যায় করলে কাপ্তেনই তার বিচার করে। কাপ্তেন যা বলে, সবাইকে তা মেনে চলতে হয়।

আগেই বলেছি, এখানে ক্লাশের জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ঘর নেই। খোলা মাঠে ঘাসের উপর, না হয় গাছতলায় ছায়ার নীচে ক্লাশ বসে। ছেলেরা নিজের নিজের ছোট আসনখানি পেতে সার বেঁধে পড়তে বসে যায়। চেয়ার-টেবিলের হাঙ্গামা নেই। পরীক্ষার সময়ও এই ব্যবস্থা। ছেলেরা যার যেখানে খুসি বসে উত্তর লেখে। এমনো দেখা যায়, কোন ছেলে হয়তো গাছের উপর চড়ে উঁচু ডালে বসে উত্তর লিখ্‌ছে। ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেরা অবিশ্বাসের কাজ করেছে, এমন ঘটনা খুব কম দেখা গেছে। খোলা মাঠ, খোলা হাওয়া আর বাইরের আলো বাতাসে থেকে থেকে ছেলেদের মন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে। তারা



শান্তিনিকেতন—আশ্রম-তরুতলে



শান্তিনিকেতন—গাছতলায় ছেলেরা পড়িতেছে—১১৮ পৃঃ

আশ-পাশের জিনিষ নূতন চোখে দেখতে শেখে। এক বারের একটি ঘটনা বলি,—

একদিন সকাল বেলা গাছের ছায়ায় বসে ছেলেরা পড়া করছে, এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে পাখীর গান শুনে মহা খুসী হয়ে উঠ্‌লো আর আঙ্গুল বাড়িয়ে পাখীটিকে দেখিয়ে দিল। শিক্ষকমশায় দেখলেন, সুন্দর একটি পাখী গাছের ডালে বসে রয়েছে আর মাঝে মাঝে গান করছে। ছেলেটি বললে, পাখীটির গান শুনে তার মন হঠাৎ যে কি এক আনন্দে ভরে উঠেছে তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। অন্য শিক্ষক হলে এই কথায় ভয়ানক রেগে উঠ্‌তেন। কিন্তু এখানকার শিক্ষকেরা একেবারে ভিন্ন ধরণের। ছেলেটির কথায় তিনি ভারী খুসী হলেন আর পড়ানো বন্ধ করে দিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাখীর গান শুনতে লাগলেন। তারপর এই নিয়ে ছেলেদের কত উপদেশ দিলেন, কত আলোচনা করলেন।

আশ্রমটিকে ছেলেরা নিজেদের বাড়ীর চেয়েও বেশী মনে করে। আশ্রম ছেড়ে যেতে তাদের একদিনের জন্যেও মন চায় না। আশ্রমকে যে তারা কতখানি

আপনার ভাবে, তার একটি গল্প বলি। এটি অবশ্য গল্প নয়—সত্য ঘটনা।

যাদব বলে ছোট একটি ছেলে এখানে পড়তো। ছেলেটি লেখাপড়ায় যেমন, অন্য সব বিষয়েও তেমনি। লতা পাতা ফুল এই সকল ছিল তার খুবই প্রিয়। গল্পের ক্লাশে সে চমৎকার চমৎকার গল্প বলতে পারতো। ছোট ছোট ছেলেদের সে ইংরাজীতে গল্প শোনাতো। দিনরাত হাসি খুসী, আহ্লাদ। ছেলেটি যেন আনন্দ-মূর্ত্তি।

হঠাৎ তার অসুখ করলো। দিনকয়েকের মধ্যেই বাড়াবাড়ি। তখন তাকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথা হোল। একদিন সকালবেলা বড় বড় কয়েকজন ছেলে তাকে বিছানা সমেত আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে রওনা হোল। ছেলেটি এতক্ষণ এসব বুঝতে পারেনি। খানিকদূর গেলে পর যখন সে টের পেলে যে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, “আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি যাব না—আশ্রম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।—আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল।—” সঙ্গে যে ডাক্তারটি ছিলেন, তিনি বললেন, এভাবে যদি ও অস্থির

হয়, তাহলে বড় খারাপ হবে। তখন তাকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনা হোল। কলকাতা থেকে ভাল ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হোল। ছেলেরা দিন নেই রাত নেই, প্রাণ দিয়ে তার সেবা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। ছেলেটি শেষে মারা গেল। মারা যাওয়ার খানিক আগে ছেলেটি কেবলই বল্‌ছিল, "সে ফুলটি আর তো ফুটবে না—আর তো ফুটবে না!—" পাশে যে শিক্ষক মশায় বসেছিলেন, তিনি চোখের জল মুছে বললেন, "ভয় নেই, খোকা—সে ফুলটি ফুটবে।—"

বড় বড় ছেলেরা কত রকমের কাজ নিয়েই থাকে। আশ্রমের নিকটে যে সকল গ্রাম আছে, সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে তারা মেলা মেশা করে—তাদের লিখতে পড়তে শেখায়। অসুখ বিসুখ করলে ওষুধ-পথ্য দেয়—সেবা-শুশ্রূষা করে। আপদ বিপদে তাদের সাহায্য করে। গ্রামে একবার আগুন লেগে ছিল। গ্রামের লোকেরা কিছুই না করতে পেরে খালি চেঁচামেচি করতে থাকে। শেষে আশ্রমের ছেলেরা গিয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়।

ছেলেরা কত দিক দিয়ে যে কত জিনিষ শিখতে

পায়, তা বলা যায় না। সময় সময় তারা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। আর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা রকমের লতা পাতা ঘাস ফুল ফল সংগ্রহ করে কত নূতন নূতন বিষয় শেখে। কাঁটা খোঁচা লেগে পায়ের তলা তাদের ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। এখানে একটা কথা বলা দরকার। আশ্রমের ছেলেদের জুতো পায়ে দেওয়ার নিয়ম নেই। খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে তাদের পা খুব শক্ত হয়ে উঠে। ছেলেরা ফুলের বাগান, শাক সব্জির বাগান তৈরী করতে শেখে, আর এই সকল কাজে তাদের কতই না আনন্দ!

মাঝে মাঝে এখানে নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয়। এতে ছেলেরাও যোগ দেয়, মেয়েরাও যোগ দেয়! অভিনয় এতই সুন্দর হয় যে কলকাতা থেকে অনেক গুণী লোক আসেন, তা দেখবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন অভিনয়ে নামেন, তখন তো কথাই নেই। ছেলেরা এখানে চিত্রবিদ্যা শেখে, গান-বাজনা শেখে, অভিনয় করতে শেখে আর দেশ-বিদেশের গুণী লোকদের সঙ্গে মিশে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সুযোগ পায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমে উপস্থিত থাকেন, ছেলেদের আরো বেশী আনন্দে দিন কাটে। তারা যখন-তখন তাঁর কাছে যায়—তাঁর মুখে গল্প শোনে, গান শোনে। এতে যে তাদের কি লাভই হয়, তা আর বলবার নয়।

এই হোল শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। কেমন? একেবারে নূতন ধরণের নয় কি? এখানে তোমাদের মতো শত শত ছেলে এখন পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় শিক্ষকদের কাছে কি রকম মন্দ ব্যবহার পেতেন আর তাতে তাঁর মনে কি রকম ব্যথা লাগতো, সে কথা গোড়াতেই তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে করে, ছেলেদের উপর যাতে কোন রকম জুলুম না হয়, সে রকমের ব্যবস্থা তিনি এখানে করেছেন।

প্রথমে গুটিকয়েক মাত্র ছেলে নিয়ে তিনি এই বিদ্যালয়টি আরম্ভ করেছিলেন। তারপর ক্রমে বাড়তে বাড়তে এখন বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঁচিশ বছর আগেকার ছোট বিদ্যালয়টি এখন এক বিশ্ব-বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ব বিদ্যালয়টির নাম "বিশ্বভারতী"। এর সঙ্গে এখন বিশ্ব-

মানবের যোগ স্থাপনা হয়ে এটি এখন বিশ্বের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারটি জগতের দুর্লভ-দুর্লভ গ্রন্থে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সকল গ্রন্থ ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি নানাদেশ থেকে উপহার এসেছে। একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও এই গ্রন্থাগারটি অধিক মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - সমস্ত বিশ্বকে এখানে নীড় করব, সমস্ত বিশ্ব এখানে এক-নীড় হবে, তাহলে মানুষের মধ্যে সেই অসীমকে, সেই ভূমাকে উপলব্ধি করব। বাইরের সঙ্গে যাওয়া-আসার পথ প্রশস্ত করতে পারলে, নির্ম্মল প্রাণপরিপূর্ণ হাওয়া সকল কলুষ দূর করবে।

এখানে সকল দেশের সকল জাতির ছাত্রেরই স্থান আছে, আর সব রকম ভাষারই চর্চ্চা হয়, যেমন—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, পালি, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী, জাপানী, গ্রীক, চীনা, ইতালিয়—আর কত নাম করব? এই সব ভাষায় জ্ঞান আলোচনা করবার জন্যে এই সব দেশ থেকে বড় বড় সব পণ্ডিত বিশ্বভারতীতে এসে থাকেন। এর ফলে বিশ্বভারতী এখন বিশ্বের যত সব গুণী লোকের, জ্ঞানী লোকের মিলন-স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের এই

মিলনের ফলে এমন এক আদর্শ সভ্যতার, আদর্শ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হবে যাতে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। রবীন্দ্রনাথ যে একদিন বলেছিলেন,—

হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

তা সার্থক হয়েছে।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন॥
... ...
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে

বাঙলা দেশ ধন্য, যে তাঁর মতো সাধক এখানে জন্মেছেন। বাঙালী আমরা ধন্য, যে তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। তিনি আমাদের বাঙলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছেন—বাঙালীর গৌরব বাড়িয়েছেন। তিনি আরো দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে বিরাজিত থাকুন—তাঁর প্রভাবে জগৎ আরো বেশী ধন্য হোক্।

এ বছর আবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আর বিদেশীদের কাছে সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করছেন। তাঁর এই যাওয়া-আসার ফলে ও-দেশের সঙ্গে এ-দেশের মিলনের পথ আরো বেশী প্রশস্ত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা এতক্ষণ তোমরা শুনলে, কিন্তু এত বলেও তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হোল না। তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁর সঙ্গ করতে হবে—তাঁর বই পড়তে হবে। গোড়াতে যা বলেছি, সেই কথাই এখানে আবার বলি। তোমরা এখন থেকে তাঁর কবিতা পোড়ো, পড়ে বুঝতে চেষ্টা কোরো, বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে নিও। যতই তোমাদের জ্ঞান বাড়বে, তাঁর লেখা পড়ে ততই তোমরা মুগ্ধ হবে। দেখবে, শুধুই কি তিনি কবি?—তিনি তপস্বী, তিনি ত্যাগী। আর গানের ভেতর দিয়ে তিনি সত্য-সুন্দরকে পেয়েছেন তাই তিনি ঋষি।

"গানের ভিতর দিয়ে যখন
দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি, আমি
তখন তারে জানি।"

তোমরা পুণ্যতীর্থ শান্তিনিকেতনে যেয়ো, আর এই তীর্থের ঋষি রবীন্দ্রনাথের চরণে প্রণত হয়ে ধন্য হোয়ো।

ইউরোপ-আমেরিকার মহিলা-সমিতি এই মহা-পুরুষকে যে বলে অভিনন্দন করেছিলেন, এস আমরাও সকলে মিলে তাঁকে সেই বলে অভিনন্দন করে, তাঁর চরণে ভক্তি-প্রণত হয়ে বিদায় হই,—

"অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ—
নব আনন্দ-ধারা ;
প্রাণে সুগভীর দিলে প্রশান্তি
গ্লানি সন্তাপ-হারা।
... ...
আত্মারে তুমি যে দান দিয়েছ
সে দান সবার সেরা,
সে তার অলোক-উদ্ভব-স্মৃতি,
স্বর্গ-আলোকে ঘেরা।"

